আনন্দমেলা



১৬ জানুয়ারি ১৯৮০
১৲
আনন্দবাজার-প্রকাশন


দেবজ্যোতি
ধু
লো
খে
লা
অতীতের সাগর সেঁচে মনি মানিক্যের সন্ধান
Please visit : http://dhulokhela.blogspot.in/
পড়ুন ও আমাদের
সংরক্ষনে সাহায্য করুন


দুষ্টুমী করার
এইতো বয়স
অ্যাডভিটামিন মালিশ করুন,
হাজার দুরন্তপনা সত্ত্বেও
স্বাস্থ্য অটুট থাকবে
বাড়ন্ত ছেলে-মেয়েরা দুষ্টুমী করবে—
এটাই তো স্বাভাবিক। রোদে খেলবে, বৃষ্টিতে
ভিজবে, খাওয়া নিয়ে গণ্ডগোল করবে—
এটাই তো নিয়ম। এতে ভাবনার কিছু নেই।
সারা বছর নিয়ম করে অ্যাডভিটামিন
মালিশ করুন। এই তেলের 'এ' ও 'ডি'
উপাদান শরীরকে দুরন্তপনার সব
চোট থেকে বাঁচাবে। ত্বক খসখসে হতে
দেবে না, হাড় মজবুত করবে।
ADVITAMIN
FOR GROWTH AND VIGOUR OF THE BABIES
AD
VITAMIN
MASSAGE OIL FORTE
SUNNY
সানি ইণ্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড

২ মাঘ ১৩৮৬ • ১৬ জানুয়ারি ১৯৮০ • ৫ বর্ষ • ১৭ সংখ্যা

বিশেষ রচনা

গল্প

ছড়া

উপন্যাস

আত্মকথা

চিত্রকাহিনী ও কমিক্‌স

লেখাপড়া

খেলাধুলো

অন্যান্য আকর্ষণ

সম্পাদক নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড-এর পক্ষে বাংপাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড, পি ২৪৮ সি আই টি রোড কলকাতা-৭০০ ০১৪ থেকে মুদ্রিত।

বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ৫ পয়সা। পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ১০ পয়সা

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা

আলি আসছেন

শঙ্করলাল ভট্টাচার্য

আলিকে আমার প্রথম দেখা খুবই আকস্মিক ভাবে। ১৯৭৭ সালের আগস্ট মাসে আমি বিশেষ কাজে লন্ডনে ছিলাম। হঠাৎ কাগজে দেখলাম মহম্মদ আলি তাঁর জীবন নিয়ে তৈরি ছবি 'দি গ্রেটেস্ট'-এর শুভারম্ভের জন্য লন্ডন আসছেন। লন্ডনের বাড়িতে বাড়িতে তখন চায়ের আসরের আলোচনার বিষয় ছিলেন আলি। ওদিকে যে-সব হলে তাঁর ছবির মুক্তি আসন্ন ছিল সেখানে ঢাউস-ঢাউস পোস্টারে ও'কে দেখা যেত। আলি তখন বিশ্বের হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়নই শুধু নন, একটি চলমান কিংবদন্তী। সত্যি বলতে কী, স্বপ্নেও তখন ভাবা যেত না যে, আমি ও'কে সামনা-সামনি কখনও দেখতে পাব। কথা বলা তো দূরের কথা।

কিন্তু দৈবের অদ্ভুত নিয়মে তার দিন চারেক পরে লন্ডনের হিলটন হোটেলের এক মস্ত সুইটে আমি আলির পাশাপাশি বসে কথা বলছিলাম! আমার এক-একটা প্রশ্নের উত্তরে লম্বা-লম্বা জবাব দিচ্ছিলেন আলি। কোনোটা বক্সিং নিয়ে, কোনোটা ও'র ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে, কোনোটা বা ও'র গভীর ধর্ম-বিশ্বাস নিয়ে। আমার কাছে জানতে চেয়ে-



'আমিই হলাম দি গ্রেটেস্ট।'



ছিলেন গান্ধীজী সম্পর্কে, হিন্দু ধর্মের প্রধান দেবতাদের সম্পর্কে, ভারতবর্ষে মুসলমানদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য সম্পর্কে। তোমরা বোধহয় জানো আলি জন্মসূত্রে মুসলমান নন। এমন কী, প্রথম যখন তিনি সনি লিস্টনকে পরাস্ত করে বিশ্বের হেভিওয়েট বক্সিং চ্যাম্পিয়ন হন তখনও ও'র নাম ছিল ক্যাসিয়াস ক্লে। এর কিছুদিন পরে ক্লে ওয়ালেস মহম্মদ নামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একজন কৃষ্ণাঙ্গ মুসলমান ধর্মগুরুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ধর্মান্তরিত হওয়ার পর থেকেই আমরা আজকের এই বিখ্যাত আলিকে পাই। কথায় কথায় আলি আমাকে ও'র ধর্মগুরুর আচার-ব্যবহার, জীবনদর্শন সম্পর্কে বলছিলেন।

আলির ব্যক্তিত্ব অসামান্য। এবং সেই ব্যক্তিত্বের সঙ্গে মিশে আছে সরলতা। উনি খুব কথা বলতে ভালবাসেন, এবং নিজের কথাতেই যেন অনেকখানি মুগ্ধ হয়ে থাকেন। আমার সঙ্গে কথা বলার অবসরে আমার টেপ রেকর্ডারটা নেড়েচেড়ে দেখে নিচ্ছিলেন ও'র কথা ঠিক রেকর্ড হচ্ছে কিনা। এছাড়া আমার দু' চারটে ভিন্ন ধরনের প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে এমন মুখভঙ্গি করছিলেন যেন আমি ও'র চোয়ালে বিকট ঘুষি লাগিয়েছি। আসলে আলি অতিশয় বুদ্ধিমান। প্রত্যেকটা কথার সঙ্গে মুখের ভাব মিলিয়ে উনি কথার একটা পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারেন। এবং যে-কোনও প্রশ্নেরই একটা-না-একটা ধারালো, রসময় উত্তর যেন ও'র তৈরি থাকে। আমাকে বলেছিলেন উনি মৃত্যুকে ভয় পান না, তবে ও'র সাহস কতখানি তা সঠিক জানেন না। শুধু এটুকুই জানেন যে, তিনি কাপুরুষ নন। না হলে ওই ছোকরা বয়সে কে পারত দৈত্যপ্রতিম সনি লিস্টনকে রিঙের ক্যানভাসে গড়াগড়ি খাওয়াতে? আলি বলেছিলেন, "যখন ভাবি, আমি নির্ভয়ে লিস্টনকে খতম করেছি, কিংবা ফ্রেজিয়ার এবং জর্জ ফোরম্যানকে—তখন নিজেকে সাহসী বলে বর্ণনা না করে পারি না।"

আমরা জানি, আলি বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের খেতাবটা দীর্ঘতম সময় ধরে আগলে রেখে-ছিলেন। এবং সেটা সাহসের পরিচয়। খ্যাতির সঙ্গে সঙ্গে স্বস্তি বাড়ে। দিনে দিনে বয়সও বাড়ে। বক্সিংয়ে বয়স বিরাট শত্রু। অথচ আলি তাঁর বক্সিং জীবনের প্রায় শেষের দিকে তাঁর শ্রেষ্ঠ কয়েকটি লড়াই লড়েছেন। ফ্রেজিয়ারের সঙ্গে ম্যানিলায় তাঁদের তৃতীয় সাক্ষাৎকারে আলি যে লড়াই লড়েছেন তা বক্সিংয়ের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। নবম রাউন্ডে আলির সমস্ত উদ্যম এবং দম যেন শেষ হয়ে যাচ্ছে। প্রায় পরাজয়ের মুখোমুখি তিনি তখন। হঠাৎ আল্লাকে স্মরণ করে নিজেকে বললেন, আমি না চ্যাম্পিয়ন? একজন চ্যাম্পিয়ন কখনও কি শেষ না দেখে ছাড়ে? এর পর আলি আরও পাঁচ রাউন্ড ধরে যে-ভাবে লড়েছিলেন তাতে অনেক দর্শকেরই ধারণা হয়েছিল, তিনি যেন সবে রিঙে নেমেছেন।

চতুর্দশ রাউন্ডে রক্তাপ্লুত ফ্রেজিয়ার রণে ক্ষান্ত দিলেন। বিজয়ী আলি ড্রেসিং রুমে ফিরে গিয়ে বললেন, "এরকম এক-একটা লড়াইয়ে আমরা মৃত্যুর কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াই।"

জাইরেতে জর্জ ফোরম্যানের সঙ্গে লড়াইয়ের সময় ফোরম্যান ছিলেন চ্যাম্পিয়ন। আলি চ্যালেঞ্জার। এর আগের কয়েকটা লড়াইয়ে ফোরম্যানের ফর্ম দেখে বিশেষজ্ঞরা বলেছিলেন, আলি বেশিক্ষণ টিকতে পারবেন না। ফোরম্যান নিজেও বলে বেড়াচ্ছিলেন, আলিকে আমি ছাতু করে দেব। কিন্তু সেবার আলির ঘুষির সামনে ফোরম্যান চোখে অন্ধকার দেখেছিলেন। সাত রাউন্ডে ফোরম্যান জব্দ হয়েছিলেন নক আউটে। এবং সেই লড়াই থেকেই প্রসিদ্ধ হয় ওঁর 'রোপ-এ-ডোপ' বা দড়ির ভেলকির খেলা। লন্ডনের হোটেলে বসে আলি আমাকে তাঁর এই অভিনব পদ্ধতির কথা বলেছিলেন। কীভাবে মুখ গার্ড করে তিনি দড়ির ওপর পিঠ দিয়ে ঝুলে থাকতেন, বিশ্রাম নিতেন। এবং প্রতিপক্ষকে সুযোগ দিতেন ওঁকে আক্রমণ করার, আঘাত করার। তিনি যত জোরেই মারুন না কেন আলি সেই মারের তেজ যেন বিদ্যুতের মতন প্রবাহিত করে দিতেন দড়ির মধ্যে। এক-একটা মারের শক্ যেন হজম করে নিত রিঙের দড়িটা। এরকম কিছুক্ষণ আলির ওপর অবান্তর আক্রমণ চালিয়ে প্রতিপক্ষ হাঁপিয়ে উঠলে আলি

তাঁকে পেটাতে শুরু করতেন। আলির এই 'রোপ-এ-ডোপ'-এর সবচেয়ে বড় শিকার ছিলেন ফোরম্যান।

কিন্তু এত শত কথা যখন আলি আমায় বসে বসে বোঝাচ্ছিলেন, আমি লক্ষ করেছিলাম উনি কত নির্মোহ হয়ে, নিজেকে যেন নিজের থেকে আলাদা করে নিয়ে, কথা বলতে পারেন। আমার ধারণা আলির সবচেয়ে বড় ভক্ত বুঝি আলি স্বয়ং। দীর্ঘাঙ্গ এই সুপুরুষ বক্সারের শরীরটা যেন স্ট্যাচুর মতো। বাস্তবিক অর্থে আলি সুপুরুষ। এবং সে-কথা উনি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলেন। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে তিনি নিজের কাছে উচ্চারণ করেন, আমি পৃথিবীর সবচেয়ে বিখ্যাত লোক। আমিই হলাম দি গ্রেটেস্ট। এবং এই সব কথার কোনও এক ফাঁকে তিনি যেন প্রায় নিজেকে স্মরণ করানোর জন্যই বলেন, কিন্তু আমার এই সমস্ত শক্তি, খ্যাতি, সৌন্দর্যই আল্লার দান। আমার সমস্ত সংগ্রাম এবং কাজের মধ্যে দিয়ে আমি তাঁরই কাজ করি। তিনিই আমার সমস্ত কিছুর পিছনে।

আলির সঙ্গে দেখা হওয়ার একটু পরেই ওঁর মানবিকতা আমায় স্পর্শ করেছিল। তখন সন্ধ্যা ছটা কি সাড়ে ছটা। আমি এবং আনন্দবাজারের ফোটোগ্রাফার অলক মিত্র দাঁড়িয়ে ছিলাম হিলটন হোটেলের ফয়ারে। আলি নামলেন তাঁর বিশাল দলবল নিয়ে। হোটেলের ফয়ার ভিড়ে ভিড়াক্কার। সবাই একবার আলির দর্শন পেতে চায়। আমি এক সময় সুযোগ বুঝে ওঁর সামনে এসে হাজির হলাম। বললাম, ''আমার দেশের লোক আপনাকে তাদের হীরো জ্ঞান করে। আমি চাই আপনার একটা ইন্টারভিউ তাদের উপহার দিই।''

আলি বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। বললেন, ''এবার আমি কোনও কাগজকেই কোনও ইন্টারভিউ দিইনি। আমি অক্টোবর মাসে ফের লন্ডন আসব, তখন আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।''

আমি বললাম, "আমি অক্টোবর পর্যন্ত লন্ডনে নাও থাকতে পারি।"

আলি হাসলেন। বললেন, "তাহলে ইন্ডিয়াতে আমার একটা ফাইটের বন্দোবস্ত করুন।"

আমি বললাম, "ইন্ডিয়ার অত বিদেশী মুদ্রা কোথায়? আপনারা তো কোটি টাকার কমে কথাই বলেন না।"

এবার আলি খুব জোরে-জোরে হেসে উঠলেন। বললেন, "আমি তো এখন ডিনারে যাচ্ছি অন্যখানে। খুব খিদে পেয়েছে। কী করে আপনাকে সময় দিই বলুন?"

এর পর আলি তাঁর দলবলের সঙ্গে হিলটনের পেছনের কার পার্কের দিকে



বাঘের মতো লড়েন আলি, কিন্তু কোলে যখন শিশু, তখন তিনি একেবারে অন্য মানুষ।

এগোলেন। আমি অলককে বললাম যত খুশি ছবি তুলে যেতে। এটা বোধহয় আমাদের আলি দর্শনের ইতি। কার পার্কেও দু'তিনশো লোকের ভিড়। আলি একা-একা একটা লিমুজিনে গিয়ে উঠলেন। আমরা দর্শকরা দাঁড়িয়ে রইলাম পঞ্চাশ গজ দূরে। কিন্তু ওমা! ওটা কী? আমি স্পষ্ট দেখলাম আলি গাড়ির পিছনের সীটে বসে দরজাটা খুলে আমায় ইশারায় ডাকছেন। আমি যেন একটা



'ইতিহাসে লেখা থাকবে আলি প্রতিজ্ঞা পালন করেছিলেন।'

ঘোরের মধ্যে ছুটে গেলাম। আলি বললেন, "ঠিক আছে, আপনি কাল সকাল দশটায় আসুন। আমি আপনাকে সময় দেব। কিন্তু আপনার নাম কী?" সংক্ষেপে বললাম, "শঙ্কর।" আলি বললেন, "শঙ্কর? ও কে, আই উইল রিমেমবর।" পরের দিনও কিন্তু আমার নাম আলির মনে ছিল।

কিন্তু আলির মানবিকতার আরও বড় পরিচয় পেলাম ইনটারভিউয়ের অবসরে। কথা হচ্ছে আলির সঙ্গে, এমন সময় হুইল চেয়ারে একটি নুলো ইংরেজ ছেলে ঘরে ঢুকল। সে কিছু সাহায্য চায়। আলি সঙ্গে সঙ্গে কুড়িটা পাউন্ড তার হাতে তুলে দিলেন। এবং ঘরের সবাইকে বললেন, "আমি কালো মানুষদের অধিকার নিশ্চয়ই চাই। কিন্তু আমাদের মনে রাখা দরকার এরকম শ্বেতাঙ্গদের কিন্তু আমরা বন্ধু। পৃথিবীর অক্ষম, অসহায় মানুষদের সঙ্গে আমাদের কোনও বিবাদ নেই। সে সাদাই হোক আর যাই হোক।"

এর পর আমি আলিকে দেখি ঢাকা শহরে ১৯৭৮-এর ফেব্রুয়ারি মাসে। বাংলাদেশ সরকার তখন তাঁকে সম্মানীয় নাগরিকত্ব দিচ্ছিলেন। আমি আলির বাংলাদেশ সফর নিয়ে রিপোর্ট করতে গিয়েছিলাম। কিন্তু আলি তখন আর বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন নেই। তার দু'দিন আগে লেওন স্পিংকসের কাছে তাঁর খেতাব হারিয়েছেন। স্বভাবতই তাঁর মুখের ওপর একটা বিষাদের ছায়া। লড়াইয়ের চোটে তাঁর চোখ দুটো ফোলা-ফোলা। একটা প্রায় আধ-বোজা। গালের এক পাশেও এক ডেলা রক্ত জমে আছে। আলির চোখে কালো চশমা।

কিন্তু তাঁর এই বিষাদ দিনকে দিন কেটে যাচ্ছিল যতই তিনি বাংলাদেশের দিকে-দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। ঢাকায় দেখেছিলাম গোটা শহরের লোক যেন উপচে পড়ছে তাঁকে দেখার জন্য। এরকম স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন আমি জীবনে দু'একবারই হয়তো দেখেছি। আলি নিজেও রীতিমত অভিভূত হয়ে পড়ছিলেন। এবং দেখতে-দেখতে তাঁর মুখের ওপর থেকে বিষাদের সেই কালো মেঘ কোনও এক সময় উঠে গেল। আমি ফের খুঁজে পেলাম সেই পরিচিত, প্রাণচঞ্চল, বাক্‌পটু আলিকে। মিটিংয়ে মিটিংয়ে তখন আলি ঘোষণা করছেন আমিই একমাত্র মানুষ, যে দু'দুবার বিশ্ব হেভিওয়েটের মুকুট জয় করেছে। আমি আপনাদের সামনে প্রতিজ্ঞা

করছি আমি তৃতীয় বারের মতন সেই মুকুট জয় করে নেব। আপনারা যে ভালবাসা আমায় দিয়েছেন তার প্রতিদানে এটুকু আমায় করতেই হবে। আপনাদের এত আশা, এত ভালবাসা আমার পরের লড়াইয়ে শক্তি যোগাবে। এবং ইতিহাসে লেখা থাকবে আলি সেই প্রতিজ্ঞা যথাযথ পালন করেছিলেন। পরের লড়াইয়ে স্পিংকস তাঁর সামনে দাঁড়াতে পারেননি।

তবে আমার হৃদয়ে আলির সব চেয়ে সুন্দর স্মৃতিটা একটু অন্যরকম। ঢাকাতে আলি একটা প্রদর্শনী লড়াই লড়তে চান। অথচ স্পারিং পার্টনারের অভাবে সেটা ভেস্তে যেতে বসেছে। এদিকে বাংলাদেশে আলির সঙ্গে কিছুটা ঘুঁষি-ছোঁড়াছুড়ি করার মতো কোনও বক্সারও নেই। অগত্যা ঢাকার সেই বিশাল স্টেডিয়ামে আলির মুখোমুখি তিন রাউণ্ডের জন্য দাঁড়াল একটি বারো বছরের ছেলে। পুরো বক্সিংয়ের পোশাকে দুজনে মুখোমুখি! সবাই দেখল আলির প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁর বিশাল উঁচু প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে চোখ কান বুঁজে ঘুঁষি ছুঁড়ে যাচ্ছে। আর সেই কিংবদন্তীর নায়ক আলি মুখ গার্ড করে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন গোটা রিঙ জুড়ে! হাজার হাজার দর্শকের কাছে সেদিন এই মজার খেলাটা এত উপভোগ্য হয়েছিল যে কী বলব! দেখতে-দেখতে আলি দু'দুবার নক্ আউট হয়ে যাওয়ার ভান করে মাটিতে পড়ে গেলেন। তৃতীয় রাউণ্ডের শেষে রেফারী জাজমেণ্ট দিলেন কিশোরই জয়ী। আলি রোগা ছেলেটিকে কোলে তুলে নিয়ে খুব আদর করলেন। ওর সঙ্গে ছবি তুললেন। আমার পাশে বসে থাকা বি বি সি টেলিভিশনের রিপোর্টার এই ঘটনাটিকে উপলক্ষ করে হাসতে হাসতে বলছিলেন, "দিস ইজ দ্য ফানিয়েস্ট থিংগ সিন্স চ্যাপলিন।" তোমরা নিশ্চয় সিনেমায় দেখেছ ছোটখাটো মানুষ চার্লি কীভাবে ছড়ি ঘুরিয়ে, বিশালকায় টুপি এবং জুতো পরে দৈত্যের মতো ষণ্ডাগুণ্ডাদের নাজেহাল করে বেড়ান। আলির সেদিনের বক্সিং দেখে আমারও বারবার সেই কথাটা মনে পড়ছিল। এই লড়াই, এবং লড়াইয়ের ছবি আনন্দমেলায় তখন বেরিয়েছিল। তোমরা অনেকেই তো জানো।

এবার আলি যখন কলকাতা আসবেন আমি সেখানে থাকব না জেনে সত্যিই ভারী মন খারাপ করছে।

ফোটো অলক মিত্র



আলি। লণ্ডনে, তাঁর হোটেলের ঘরে।



খুনী

সমরেশ মজুমদার

এত তাড়াতাড়ি সন্ধে হয়ে যাবে বুঝতে পারেনি ওরা। কাউকে না বলে দশ মাইল দূরে পলাশবাড়িতে খেলতে এসেছিল হায়ারে, এখন সাইকেলে উঠে সন্তুর বুক ঢিপ-ঢিপ করছে, দীপুর মুখ শুকনো। দিনটাকে যদি হনুমানের মতো আর একটু ধরে রাখা যেত তাহলে পাঁই পাঁই করে ঠিক বাড়ি পেঁছে যেতে পারত।

হাওয়ায় সাইকেল দুটো যেন উড়ছিল। পিচের রাস্তাটা মসৃণ এবং ঢালু। কিন্তু মরাঘাটের মোড় পার হতেই টুক করে সূর্যটা ডুবে গিয়ে সন্ধেটাকে ছড়ে দিল চারপাশে। উত্তেজনায় ওরা এতক্ষণ কথা বলছিল না। সামনের রাস্তাটা যখন কালো হয়ে গেল, দুপাশে জঙ্গলের ঝিঁঝিঁগুলো যখন একসঙ্গে শব্দ করে উঠল তখন দীপু বলল, ''আমি কিছু দেখতে পারছি না রে।'' সন্তুর কপালে ঘাম কিন্তু হাত পা ঠান্ডা, ফিসফিসিয়ে বলল ''জোরে চালা এই জঙ্গলে হাতি আছে।''

ডুয়ার্সের ওদিকটায় হাতির আনাগোনা বেশি। দীপু বলল, ''তাহলে গান গাইতে গাইতে গাইতে চল।'' বলেই ''দুর্গম গিরি কান্তার মরু'' গাইতে লাগল কাঁপা গলায় চেঁচিয়ে। মাথার ওপরে রাস্তার দুপাশের গাছের ঝাঁকড়া ডাল ছাদের মত ঝুলে আছে। তার গায়ে বসে থাকা পাখির চিৎকার ওদের গানের শব্দে যেন থেমে গেল আচমকা। অ[illegible]র তিনটে শেয়াল একসঙ্গে ডেকে উঠল ঘাবড়ে গিয়ে।

বিনাগুড়ির মোড়টা পেরিয়ে গেল শাঁ করে। আর মাইল চারেক। তারপর কোনোরকমে সাইকেল রেখেই চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়া শুরু করে দেবে। একবার পড়তে আরম্ভ করলে বাবা আর কিছু বলবেন না, ওতে নাকি পড়ুয়ার মনোযোগ নষ্ট হয়। কিন্তু তার আগে বাবার মুখোমুখি হলে না-বলে সাইকেল নিয়ে সন্ধের পর বাড়ির বাইরে থাকার জন্য—আরও জোরে প্যাডেলে চাপ দিল সন্তু। ওরা যখন ''আজি অলক্ষে দাঁড়ায়েছে তারা'' লাইনটায় পেঁছেছে

ঠিক তখনই ঘটে গেল ব্যাপারটা। দড়াম করে একটা শব্দ, সন্তুর মনে হল ও শূন্যে উঠে যাচ্ছে, সাইকেলের সিটটা পায়ের সঙ্গে জড়ানো। তারপরেই দুটো কনুই আর হাঁটু যেন খেঁতলে দিল পিচের রাস্তাটা। আর সেই-সময়েই গায়ে কাঁটা দেওয়া আর্তনাদ উঠল অন্ধকার কাঁপিয়ে। ভয়ে ব্যথায় সিঁটিয়ে ছিল সন্তু, অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। খানিক-বাদেই চাপা ডাক এল, ''সন্তু, সন্তু, কোথায় তুই?''

আস্তে আস্তে উঠতে চেষ্টা করল সে। দীপুর গলা। কিন্তু সমস্ত শরীর কাঁপছে ওর এবং হাত পায়ে অসম্ভব যন্ত্রণা হচ্ছে। দীপুর কিছু হয়নি, বেশ কিছুটা এগিয়ে গিয়ে আবার ফিরে এসেছে সে। ''উঠে দাঁড়া, হেভি অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। তুই কেমন আছিস?''

কোনোরকমে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সন্তু বলল, ''ভাল।'' সঙ্গে সঙ্গে ও টের পেল দু'হাত আর পা দিয়ে কিছু চটচটে জিনিস গড়িয়ে নামছে। রাস্তার একপাশে ওর সাইকেলটা কেমন বেঁকে পড়ে রয়েছে। দীপু সাইকেল থেকে নেমে সেটাকে টানাটানি করতে করতে বলল, ''হ্যান্ডেলটা ঘুরে গিয়েছে, চালাতে পারবি? জলদি পালানো দরকার। লোকটা বোধহয় মরে গিয়েছে।'' সঙ্গে - সঙ্গে সমস্ত শরীরে কাঁপুনি এল এবং এইসময় অন্ধকারেও সন্তু বুঝতে পারল রাস্তার এক-পাশে ছায়া-ছায়া একটা মানুষের শরীর নিথর হয়ে পড়ে রয়েছে। লোকটা অন্ধকারে চুপচাপ আসছিল আর সে ওকে ধাক্কা দিয়ে মেরে ফেলেছে। দীপুর তাগাদায় ও কোনরকমে সাইকেলে চাপল। হাত পা জ্বলছে, চোখ ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। তার মানে কপাল থেকেও রক্ত ঝরছে। সাইকেলের পেছনের চাকা একটু বেঁকে যাওয়ায় ঘস-ঘস শব্দ হচ্ছে। লোকটার কাছ থেকে পালাতে চাইল ওরা। যদি ও মরে গিয়ে থাকে তাহলে পুলিস নিশ্চয়ই ওকে ধরবে। ফাঁসি কিংবা জেল হয়ে যাবে। সন্তু কী করবে বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করল, ''ও মরে গেছে?'' দূরে আলো দেখা যাচ্ছে এখন। সাইকেলে গুম হয়ে বসে দীপু বলল, "হুঁ।"

''একবার ফিরে. গিয়ে দেখবি?'' সন্তুর শরীর ঠান্ডা, ব্যথাগুলো টের পাচ্ছে না।

"মাথা খারাপ? বইতে পড়িসনি খুনীরা খুনের স্পটে ফিরে যায় বলেই ধরা পড়ে।''

''আমি খুনী নাকি!'' প্রায় কেঁদে ফেলল সন্তু।

"পুলিস তাই বলবে। তোর সঙ্গে ছিলাম বলে আমিও বিপদে পড়ব। খুনীর হেল্পার। তাই তোর ধরা দেওয়া চলবে না। একটা প্ল্যান করা দরকার।"

ওরা আলোর কাছাকাছি এসে যেতেই দীপু চমকে উঠল। ''ইস, কী চেহারা করেছিস। এভাবে বাড়িতে ঢুকবি কী করে?" সন্তু শুনে কেঁদে ফেলল।

দীপু আবার মাথা খাটাল। "বাজারের মধ্যে দিয়ে গেলে সবাই টের পেয়ে যাবে। তারচেয়ে চা বাগানের মধ্যে দিয়ে বোবা কম্পাউন্ডারের কাছে চল, ওষুধ লাগানো দরকার।''

বোবা কম্পাউন্ডার একলা থাকেন। সন্তুকে দেখে ওষুধ লাগিয়ে একটা কাগজে খসখস করে লিখলেন, ''কী করে হল?'' দীপু গোটা গোটা অক্ষরে পাশে লিখে দিল, "গাছ থেকে পড়ে গেছে।'' একগাদা ট্যাবলেট নিয়ে ওরা চোরের মত বাড়ির সামনে এল। এখনও এদিকে ইলেকট্রিক আসেনি। দীপু অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে ফিসফিসিয়ে বলল, "খবরদার কাউকে কিছু বলবি না। এখন স্কুল ছুটি, তাই বাঁচোয়া। বাড়ি থেকে একদম বের হবি না। যা খবর আমি দিয়ে যাব। এখন আমরা ক্রিমিনাল।''

ডিটেকটিভ বই সন্তুও পড়ে, বুঝতে অসুবিধে হল না। বাড়িতে ঢুকতেই মা চিৎকার করে উঠলেন হাঁ-হাঁ করে উঠলেন। বাবার চোখ দেখে সন্তু বুঝল, শরীরে ব্যান্ডেজ না থাকলে আজ আড়ংধোলাই খেতে হত।

সমস্ত শরীরে ব্যথা, সন্তু ঘুমুতে পারছিল না। লোকটা মরে গেল! অন্ধকারে চুপচাপ আসার কী দরকার ছিল? ওরা অবশ্য ঘন্টি বাজায়নি কিন্তু গান গাইছিল তো, শোনেনি লোকটা? সে একটা লোককে খুন করে ফেলল! ইচ্ছে করে করেনি এটা পুলিসকে কী ভাবে বোঝাবে? বাবাকে সত্যি কথা বলে দেবে যদি কিছু ব্যবস্থা হয়? দীপুর উপদেশ মনে পড়ল, আগ বাড়িয়ে ধরা দেবার কোন মানে হয় না। এমনও তো হতে পারে লোকটা অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে রাস্তায়। তাই যদি হয় রাত্তিরে

কোন ছুটন্ত লরি ওকে চাপা দিয়ে যেতে পারে অথবা জঙ্গলের জন্তু-জানোয়ার খেয়ে ফেলতেও পারে। বাঘ নেই এদিকে, কিন্তু শেয়াল—শেয়াল কি মানুষ খায়? নেকড়ে তো আছে? ঘামে শরীর জবজবে হয়ে গেল ওর।

সকাল সাতটা নাগাদ দীপু এল। বিজন মাস্টারের কাছে পড়তে যাওয়ার নাম করে বলে গেল কেউ কিছু টের পায়নি। এদিকে শরীরটা ম্যাজ ম্যাজ করছে, কেমন জ্বরো-জ্বরো ভাব। এমন সময় একজন লোক ওকে ডাকতে এল। বাবা অফিসে চলে গেছেন। মা রান্নাঘরে। সন্তু তাড়াতাড়ি লোকটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ওকে কোনোদিন এই ধরনের কোনও লোক খুঁজতে আসেনি কখনও। তাহলে কি সব ধরা পড়ে গেছে? লোকটি বলল, বোবা কম্পাউন্ডার তার খোঁজ করছেন, এখনই যেতে বলেছেন। তার মানে হয়ে গেল। সন্তু ফ্যালফ্যাল করে চারপাশে তাকাল। এই চাঁপা-ফুলের গাছ, মাঠ, চা বাগান, বাবা-মা সবাইকে ছেড়ে জেলে যেতে হবে তাকে। কাউকে কিছু না বলে লোকটির সঙ্গে হাঁটতে লাগল সে। কাউকে দেখানোর মতো মুখ তার নেই। দীপুকে খবর দেওয়া দরকার। না, ওকে জড়িয়ে কী হবে।

চা-বাগানের মধ্যে দিয়ে বোবা-কম্পাউন্ডারের বাড়িতে যেতে হয়। পুলিসের গাড়িটা সামনে নেই কেন? সবাই কি ভেতরে বসে আছে! ও ঢুকলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে হাত-কড়া পরিয়ে দেবে? তা ওরা ওদের বাড়িতেও আসতে পারত! বোধহয় বোবা কম্পাউন্ডারের সাক্ষী চাইছে। সঙ্গের লোকটা ভেতরে ঢুকল না। সন্তু আড়ষ্ট পায়ে খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে প্রথমে বোবা কম্পাউন্ডারকে দেখতে পেল। একদৃষ্টে চেয়ে আছেন। আর সেই সময় কে যেন তার দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ভয়ে আধমরা হয়েই ছিল, সন্তু দু হাত তুলে সারেন্ডার করতে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ও শুনল হাউ-মাউ করে কে ওর পায়ের সামনে বসে কাঁদছে। প্রচণ্ড বিস্ময়ে সন্তু দেখল কুলিগোছের একটা রোগা লোক দুটো হাত মুখের ওপর জোড়া করে বলল, 'মাপ কিজিয়ে খোকাবাবু, হাম থোড়া বেহোশ থা, আপকো বহুত চোট লাগায়া হাম। মাপ কিজিয়ে—।" হু হু করে কাঁদছিল লোকটা। সন্তু ঘাবড়ে গিয়ে দেখল লোকটার মুখচোখ ফুলে ফেঁপে বীভৎস হয়ে গেছে। চোখ তো ভাল করে দেখাই যাচ্ছে না। জামায় হাতে পায়ে রক্ত শুকিয়ে কালো হয়ে গিয়েছে।

এই লোকটাকে সে কাল ধাক্কা দিয়ে মেরে ফেলেছিল, অথচ আজ ও তার কাছে ক্ষমা চাইছে উলটে! সন্তুর চোখে জল এসে গেল, কোনোরকমে বলল, "নেহি, নেহি—।"

"হাম আপকো মার ডালা—কসুর মাপ কর দিজিয়ে।" লোকটা নাছোড়বান্দা।

এমন সময় বোবা কম্পাউন্ডার আঙুল নেড়ে ডাকলেন। কাছে আসতে একটা কাগজ নিয়ে খসখস করে লিখলেন. "তুমি মিথ্যেবাদী!"

কোনোরকমে ঘাড় নাড়ল সন্তু, হ্যাঁ।

খুশি হয়ে বোবা কম্পাউন্ডার আবার লিখলেন, "কার ক্ষমা চাওয়া উচিত?"

হাত থেকে পেন্সিলটা নিয়ে বড় বড় করে সন্তু লিখল, "আ মা র।"

ছবি মাখন দত্তগুপ্ত

প্রেসিডেন্সি কলেজের করিডোরে কয়েকটি ছেলে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। একটি ছেলে উত্তেজিত কণ্ঠে বলছে, "কটকের র‍্যাভেন্‌শ কলেজ থেকে যে ছেলেটি নতুন এসে ভর্তি হয়েছে, শুধু মেধায় নয়, চরিত্রের দৃঢ়তায়ও তার সমকক্ষ কেউ নেই কলেজে। জানো, এই ছেলেটি কিন্তু ছোটবেলায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে বালক-সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছিল।" শ্রোতাদের মধ্য থেকে একটি ছেলে মৃদু আপত্তি তুলল, "না, না, এতটা সত্যি নয়।" বক্তা-ছাত্রটি রেগে গিয়ে বলল, "আলবত সত্যি। তাছাড়া তুমি কী করে জানলে যে কথাটা সত্যি নয়?" প্রতিবাদী ছেলেটি অপরাধীর মতো মুখ করে উত্তর দিল, "আমিই কটকের সেই ছাত্র, আমার নাম সুভাষ।"



কে?

বিমল মিত্র

আগে যা ঘটেছে : জয়রামবাবুর ছেলে জ্যোতি নিরুদ্দেশ। বড়লোক-বাবার অভিমানী ছেলে চন্দ্রভানু চুরি করেছেন তাকে। জ্যোতিকে নিয়ে ট্রেনযাত্রায় মধ্যরাত্রে দুর্ঘটনা ঘটে। হাসপাতালে জ্ঞান ফেরে চন্দ্রভানুর। এদিকে পুলিশের-হাতে-আটক বেহুঁশ ছেলেটিকেই জ্যোতি ভেবে গ্রহণ করেছেন জয়রামবাবু, ওদিকে হাসপাতাল থেকে পালিয়ে আসল-জ্যোতি চান্দোলির এক দোকানীর ঘরে আশ্রয় নিয়েছে। চান্দোলির সূর্যনারায়ণ জয়রামবাবুর পুরনো বন্ধু, ইতিমধ্যে কলকাতায় এসেছেন তিনি। তারপর—

॥ ১১ ॥

সূর্যনারায়ণবাবুর সঙ্গে জয়রামবাবুর বহুদিনের বন্ধুত্ব। সূর্যনারায়ণবাবু ছোটবেলায় কলকাতার হোস্টেলে থেকে লেখা-পড়া করতেন। তখন দু'জনে একই কলেজে একই সঙ্গে একই ক্লাসে পড়তেন। তখন কারোরই বিয়ে হয়নি। কোথায় চান্দোলি আর কোথায় কলকাতা। জয়রামবাবুর তখন মফস্বলের ছাত্র। হোস্টেলেই থাকতেন তখন দু'জনে। তারপর পাশ করে দু'জনেই যে-যার দেশে ফিরে গিয়েছিলেন। আর তারপর যে-যার সংসার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। জয়রামবাবুর ছেলে হয়েছিল সে-খবরও সূর্যনারায়ণবাবু পেয়েছিলেন। তাঁর স্ত্রী মারা গিয়েছিলেন সে-খবরও সূর্যনারায়ণবাবু পেয়েছিলেন চিঠিতে। এক-কথায় বরাবরই যোগাযোগ রেখে চলেছিলেন দু'জনে। যত বয়েস বাড়তে লাগল, দু'জনের ভাগ্যেরও তত পরিবর্তন হতে লাগল।

খেতে বসে সূর্যনারায়ণ জিজ্ঞেস করলেন, "কী করে তোমার ছেলেকে পেলে? পুলিস খুঁজে বার করে দিলে?"

জয়রামবাবু বললেন, "আসলে ভাই সবই ভাগ্য। কিংবা হয়ত সবই মায়ের দয়া। আমি কালীঘাটের মায়ের সোনার জিভ গড়িয়ে দিয়েছিলাম, সেই জন্যেও হতে পারে। আর তা ছাড়া একজন জ্যোতিষীর কাছেও গিয়েছিলাম। তিনিও বলেছিলেন আমার ছেলে ফিরে আসবে। পুলিস হ'ল উপলক্ষ।"

সূর্যনারায়ণবাবু বললেন, "তাই-ই হবে। আজকালকার লোকেরা তো আবার ও-সব বিশ্বাস করে না।"

এমন সময় কৈলাস জ্যোতিষ্ককে নিয়ে ঘরে এল।

জয়রামবাবু কৈলাসকে জিজ্ঞেস করলেন, "কী হ'ল রে, ওকে আবার এ-ঘরে নিয়ে এলি কেন? ওর তো খাওয়া হয়ে গেছে।"

কৈলাস বললে, "ও যে বলছে বাবার কাছে আসবে।"

সূর্যনারায়ণবাবু ছেলেটার দিকে ভাল করে চেয়ে দেখলেন। বললেন, "এই তোমার জ্যোতি? মাথাটা ন্যাড়া করে দিয়ে অন্য রকম দেখাচ্ছে। সেই কত বছর আগে ওকে দেখেছিলাম। বোধহয় তখন ওর দু' বছর বয়েস।"

জয়রামবাবু ছেলেকে আদর করতে লাগলেন। বললেন, "এখন তো তবু একটু ভাল দেখছ। অনেক ডাক্তার দেখিয়ে অনেক ওষুধ-টষুধ খাইয়ে তবু একটু সেরেছে। প্রথম যখন এসেছিল তখন একেবারে রোগা প্যাকাটি হয়ে গিয়েছিল।"

"আর সে-লোকটার কী হ'ল?"

"সে-লোকটার ছ'মাস জেল হয়ে গেছে। ব্যাটা এক-নম্বরের শয়তান। এত বড় শয়তান যে আবার আমাকে একটা চিঠি লিখে রেখে দিয়ে গিয়েছিল। লিখেছিল, 'আমি আপনার ছেলেকে ভাল করে মানুষ করব। আপনি কিছু ভাববেন না।' কত বড় আস্পর্ধা দেখ।"

সূর্যনারায়ণবাবু বললেন, "তোমার জ্যোতির যদি স্বাস্থ্য ভাল করতে চাও তো ভাই ওকে নিয়ে কিছুদিন চেঞ্জে যাও না। তোমারও শরীর ভাল হবে, তোমার জ্যোতিরও স্বাস্থ্য ভাল হয়ে যাবে।"

জয়রামবাবু বললেন, "ভাল কথাই বলেছ।"

"হ্যাঁ, হয় পুরী, কি মধুপুর, আর নয় তো আমার ওখানেই কিছুদিন ঘুরে আসবে চলো।"

হঠাৎ জ্যোতিষ্ক জিজ্ঞেস করলে, "এ কে বাবা?"

জয়রামবাবু বললেন, "ইনি আমার বন্ধু, তোমার কাকাবাবু হন। এঁকে প্রণাম করো।"

জ্যোতিষ্ক সূর্যনারায়ণবাবুর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে হাত দুটো মাথায় ঠেকালে।

সূর্যনারায়ণবাবু জ্যোতিষ্কর মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। বললেন "বেঁচে থাকো বাবা, আশীর্বাদ করি বড় হয়ে বংশের মুখ উজ্জ্বল করো। আর কক্ষনো কেউ ডাকলে যেন তার সঙ্গে যেও না। নিজের লোক ছাড়া কাউকে বিশ্বাস কোরো না।"

জ্যোতিষ্ক মাথা নেড়ে বললে, "না।"

জয়রামবাবু বললেন, "আগে ভাই ভাল করে বাংলাও বলতে পারত না। এমন মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল যে কিছুই মনে করতে পারত না। এখন আমি আবার মাস্টার রেখে ওকে বাংলা ইংরেজি লেখা-পড়া শেখাচ্ছি। কোথা থেকে যে ওর মুখে সব সময়ে হিন্দি ভাষা বেরোত কে জানে!"

তারপর কৈলাসকে ডেকে ওকে পাশের ঘরে নিয়ে যেতে বলে দিলেন। বললেন, "যাও খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেছে, এবার একটু ঘুমোও গে যাও—"

জ্যোতিষ্ক চলে গেল।

জয়রামবাবু বললেন, "ছেলে যে কী বস্তু তা তুমি ভাই বুঝবে না। ছেলে-মেয়ে থাকলে তুমি আমার কষ্টটা বুঝতে। তার ওপর আবার মা-হারা ছেলে ও।"

সূর্যনারায়ণবাবু বললেন "আমি ভাই এবার উঠি জয়রাম। আমাকে আবার এখন একবার উকিলের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে কোর্টে যেতে হবে। তা তুমি কিন্তু এবার জ্যোতিকে নিয়ে আমার বাড়িতে যাবে, ওই কথা রইল—"

বন্ধুকে বিদায় দিতে গিয়ে জয়রামবাবু বললেন, "দেখি, যেতে চেষ্টা করব।"

"দেখি-টেখি শুনছি না। আমি তোমার কাছে কতবার এলাম, এবার তোমাকে একবার আমার ওখানে যেতেই হবে, এই বলে রাখছি। জ্যোতিকে সঙ্গে নিয়ে যাবে।"

বলে তিনি চলে গেলেন।

●

দেবরাজ চৌবের ব্যবসা ভালই চলছিল। নতুন ছেলেটা আসবার পর থেকে তার ব্যবসা আরও ভাল করে চলতে লাগল। সাত-সকালে উঠেই দোকানে ধুনো গঙ্গাজল দিয়ে দোকান খোলে। তারপর খদ্দেররা আসতে আরম্ভ করে। চৌবেজির আয় তখন আরও বেড়েছে। দুপুর বেলাটা এক ঘণ্টার জন্যে দোকান বন্ধ থাকে। তখন খেয়ে দেয়ে উঠে খোকা চন্দোলির এদিক-ওদিক বেড়াতে যায়। যাক, ঘোরা ভাল। ছেলেটার বড় ঘোরা অভ্যেস। চৌবেজি তখন কিছুক্ষণের জন্যে ঘুমিয়ে নেয়। তারপর নিজেই দোকান খুলে বসে থাকে। এক-একদিন অনেক পরে এসে হাজির হয় খোকা।

চৌবেজি জিজ্ঞেস করে, "কোথায় গিয়েছিলি তুই ?"

খোকা বলে, "গঙ্গার ধারে।"

"গঙ্গার ধারে কী দেখতে যাস রোজ রোজ ?"

খোকা বলে, "নৌকো দেখি। ঘাটে নৌকো বাঁধলে আমি মাঝিদের সঙ্গে গল্প করি। তারা তামাক খেতে খেতে দেশ-বিদেশের গল্প করে, আমি শুনি। জানো বাবা, নৌকো-গুলো অনেক দূরে দূরে যায়। এখান থেকে নাকি নৌকোয় করে কলকাতাতেও যাওয়া যায়। আমি ওদের সঙ্গে একদিন কলকাতায় যাব। কলকাতা কী রকম জায়গা বাবা ?"

চৌবেজি বলে, "খবরদার, ওদের কথায় যেন ভুলো না। ওরা তোমাকে কলকাতার লোভ দেখিয়ে অন্য লোকের কাছে অনেক টাকা দিয়ে বিক্রি করে দেবে। ওরা খুব খারাপ লোক। খুব সাবধান।"

তা সেদিন এক কাণ্ড ঘটে গেল।

সূর্যনারায়ণবাবু বাজার থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। ভিড়ের মধ্যে থেকে খোকা তাঁকে চিনতে পেরেছিল। এ-রকম প্রায়ই দুপুরবেলা তিনি বেরোন। অনেক দিন খোকা তাঁকে দেখেছে। সেদিন সূর্যনারায়ণবাবু একটা দোকানে কী কিনছেন। একটা লোকও তাঁর কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে কিছু একটা কিনছিল। সেই সময় তার হঠাৎ নজরে পড়ল সে-লোকটা সূর্যনারায়ণবাবুর পকেটে হাত দিয়ে কী যেন তুলে নিলে। তুলে নিয়েই খুব তাড়াতাড়ি অন্যদিকে চলতে লাগল। সূর্যনারায়ণবাবু টেরও পেলেন না।

খানিক দূরে গিয়ে লোকটা দৌড়তে লাগল। তখন আরও সন্দেহ হল তার।

নিশ্চয় লোকটা চোর। সে-ও লোকটার পেছন-পেছন দৌড়তে লাগল। সে-ও যত দৌড়য়, লোকটাও তত দৌড়য়। কিন্তু খোকা তখন আরও জোরে দৌড়তে আরম্ভ করেছে।

কিন্তু লোকটা খোকার কাছে হেরে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে খোকা চেঁচিয়ে উঠেছে, "চোর—চোর—"

আর সঙ্গে-সঙ্গে লোকটাকে জাপটে ধরেছে। কিন্তু লোকটার গায়ের জোরের সঙ্গে সে পারবে কেন? চোরটা জামার পকেট থেকে একটা ছুরি বার করে খোকার কাঁধে বসিয়ে দিয়েছে। তবু খোকা ছাড়েনি তাকে। তখনও জোরে জোরে চেঁচাচ্ছে—"চোর—চোর—"

ততক্ষণে অনেক লোক জড়ো হয়ে লোকটাকে ধরে ফেলেছে।

খোকা বলতে লাগল, "এই লোকটা বড়বাবুর পকেট থেকে টাকা চুরি করে পালাচ্ছিল, আমি নিজের চোখে দেখেছি।"

তখন খোকার শরীরটা বেয়ে ঝর-ঝর করে রক্ত পড়ছে।

"বড়বাবু কে?"

"সূর্যনারায়ণবাবু।"

সঙ্গে সঙ্গে খবরটা চলে গেল সূর্যনারায়ণবাবুর কাছে। তিনি তখন বাড়ি ফিরে গিয়ে পকেটের টাকাগুলো গুনছিলেন। ব্যাঙ্ক থেকে দু' হাজার টাকা তুলে নিয়ে আসছিলেন। সেই টাকাটা পকেটে নেই। কোথায় গেল টাকাগুলো? তাঁর মনে আছে তিনি টাকাগুলো তাঁর জামার পাশের পকেটে রেখেছিলেন। সমস্তই একশো টাকার নোট।

যে-লোকটা তাঁর টাকা চুরির খবর দিতে এসেছিল তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "চোরটাকে ধরলে কে?"

"ওই চৌবেজির ছেলেটা।"

সেই অবস্থাতেই তিনি বেরিয়ে পড়লেন। যেখানে চোরটা ধরা পড়েছিল সেখানে তখন অনেক লোক জমা হয়েছে। চোরটার কাছ থেকে দু' হাজার টাকা পাওয়া গেছে। সেই টাকাটা সবাই তাঁর হাতে দিলে।

কিন্তু সে-টাকাগুলোর দিকে তাঁর তত মন নেই। তিনি তখন চৌবেজির ছেলেটাকে দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেছেন। বললেন, "একে এক্ষুনি হাসপাতালে নিয়ে চলো।"



খোকা একবার বলতে গেল, "বড়বাবু, ও আপনার পকেট থেকে টাকা চুরি করেছিল—"

সূর্যনারায়ণবাবু বললেন, "একজন শিগগির চৌবেজির কাছে গিয়ে খবরটা দিয়ে এসো—"

চৌবেজি খবরটা শুনে তখনই দৌড়ে এল। কিন্তু ততক্ষণে তার ছেলেকে সবাই হাসপাতালে নিয়ে চলে গেছেন। চৌবেজী তাড়াতাড়ি হাসপাতালের দিকে দৌড়ল।

তখন মতিহারিতে চন্দ্রভূষণবাবু তার নিজের ঘরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে একটু বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। হঠাৎ উঠে বসলেন। না, তিনি পাঁচ মাস ধরে সব হাসপাতালে ঘুরে ঘুরেও জ্যোতিষ্কর কোনও খোঁজ পাননি। কিন্তু ভাবলেন কার জন্যে তিনি এত খাটছেন। কে খাবে তাঁর এত টাকা!

বুলবুলচণ্ডিতে তাঁর বাবা বলতেন, "আমার এই ছোট ছেলেটা গোল্লায় যাবে।"

স্কুলের মাস্টারমশাইরাও বলতেন, "আপনার বড় ছেলেটার প্রতিভা আছে, কিন্তু আপনার এই ছোট ছেলেটার মাথায় গোবর পোরা।"

তারপরে সেই সাধুর সঙ্গে কতকাল কাটিয়েছিলেন, সব কিছু তাঁর আবার মনে পড়তে লাগল। সংসার নাকি তাঁকে করতেই হবে। কিন্তু তাঁর নাকি গৃহসুখ থাকবে না। একটা স্ত্রী নেই, একটা সন্তান নেই। এ কী-রকম সংসার তাঁর। এ কী-রকম জীবন।

তিনি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লেন। তার

পর তাঁর ম্যানেজারকে ডাকলেন। ম্যানেজার আসতেই তিনি বললেন, "আজকেই আমার জন্যে কলকাতার একটা ট্রেনের টিকিট কিনে এনে দিন,—"

ম্যানেজার হুকুম শুনে চলে গেল। সেই টিকিট নিয়ে ট্রেনে উঠে বসলেন চন্দ্রভানুবাবু। তাঁর মনে হ'ল জ্যোতিষ্ক যখন কোনও হাসপাতালেই নেই তখন সে ট্রেন দুর্ঘটনার পর নিশ্চয় নিজের বাড়ির ঠিকানায় পৌঁছে গেছে।

কলকাতায় গিয়ে একটা হোটেলে উঠলেন তিনি। তারপর যখন একটু বিকেল হ'ল, তখন তিনি একটা ট্যাক্সি ধরে আবার সেই জায়গায় এলেন। সেই পার্ক। যেখানে জ্যোতি রোজ তার চাকরের সঙ্গে ফুটবল খেলতে আসত।

রেলিঙের বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ তিনি খুঁজতে লাগলেন জ্যোতিষ্ককে। ভেতরে অনেক ছেলে ফুটবল খেলছে। কিন্তু কোথাও জ্যোতিকে দেখতে পেলেন না। তাহলে কি এখন তাকে জয়রামবাবু আর বাইরে বেরোতে দেন না?

আস্তে আস্তে তিনি জ্যোতিষ্কদের বাড়ির কাছে এলেন। এই সেই বাড়ি। বাড়ির সামনে মস্ত বড় চওড়া রাস্তা। অনেক লোক, অনেক গাড়ি, আর অনেক বাস যাতায়াত করছে সে-রাস্তা দিয়ে। তাদেরই সঙ্গে মিশে তিনি বাড়িটার বৈঠকখানা-ঘরের ভেতরের দিকে এগিয়ে দেখতে লাগলেন। সেখানে জ্যোতিষ্ক মাস্টারমশাইয়ের সামনে বসে একমনে লেখা-পড়া করছে। ঠিক কয়েক মাস আগে যেমন দেখতে পেতেন।

সেই একই মাস্টারমশাই সামনে বসে রয়েছে। শুধু তফাতের মধ্যে জ্যোতির মাথার চুলগুলো সব কামিয়ে ফেলা হয়েছে। বোধহয় ট্রেন-দুর্ঘটনার পর মাথায় চোট লেগেছিল। মাস্টারমশাই পড়াচ্ছেন, "এ-বি-সি-ডি—"

হঠাৎ জয়রামবাবুকে ঘরে ঢুকতে দেখে চন্দ্রভানুবাবু একটু আড়ালে সরে দাঁড়ালেন। শুনতে পেলেন জয়রামবাবুর কথা। জয়রামবাবু জিজ্ঞেস করছেন, "কী-রকম লেখা-পড়া শিখছে জ্যোতি? বেশ মনে রাখতে পারছে তো?" (ক্রমশ)

ছবি অনুপ রায়

ছোটদের যত সেরা বই



নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী কবিতা লিখছেন প্রায় চার দশক ধরে, কিন্তু তাঁর ছড়ার বই প্রকাশিত হল এই প্রথম। তাঁর দীর্ঘ দিনের রচনা থেকে বাছাই-করা একগুচ্ছ বাঘ-বাঘা ছড়া আর সেই সব ছড়ার সঙ্গে বিমল দাসের আঁকা বাঘা-বাঘা ছবি নিয়ে যে-বইটি বেরিয়েছে, তার নাম "সাদা বাঘ।" এই সব ছড়ার মধ্য দিয়ে নীরেন্দ্রনাথ যেন বারবার ফিরে গেছেন তাঁর শৈশবে, কৈশোরে। এই ছড়াগুলি সব-বয়সী পাঠকদেরই নিয়ে যাবে সেই কৌতূহল, রহস্য ও কৌতুকের জগতে, যে-কৌতূহল, রহস্যবোধ ও কৌতুক-সৃষ্টির সহজ প্রবণতা থেকে জন্ম নেয় সার্থক ছড়া।



মতি নন্দী এমন এক জগৎ নিয়ে লিখেছেন কয়েকটি অ সা মা ন্য উপন্যাস, যে-জগতের মাত্র একটা দিক নিয়েই আমরা মাতামাতি করে থাকি, মাত্র একটা দিকই জানি। খেলার মাঠ আর খেলোয়াড়দের নিয়ে লেখা তাঁর উপন্যাস-গুলিতে মতি নন্দী আমাদের সামনে খুলে দিলেন সম্পূর্ণ অজানা, অদেখা এক পৃথিবীর দরোজা। ক্রিকেট নিয়ে লেখা 'ননীদা নট আউট', ফুটবল নিয়ে লেখা 'স্ট্রাইকার' এবং 'স্টপার', সাঁতারের জগৎ নিয়ে লেখা "কোনি" এমন-সব নতুন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি করে দেয় আমাদের যে, সম্পূর্ণ নতুন চোখে দেখতে শিখি খেলার জগৎকে।

শঙ্করীপ্রসাদ বসুর আমাদের নিবেদিতা ৬ মৌমাছির রাজ্যের রাজা ৭ **সরলাবালা সরকারের** পিনকুর ডাইরি ৩ **সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের** ছেলেদের বিবেকানন্দ ২ **পাপু (সুব্রত সরকার)র** পাপুর বই ৬ পাপুর ছবি সঙ্গে ছড়া ৫ **পার্থসারথি চক্রবর্তীর** কেমিক্যাল ম্যাজিক ৪ চিকিৎসা বিজ্ঞানের আজব কথা ৪ রসায়নের ভেলকি ৩ ম্যাজিকের মতো মজা ৫ তত সহজ ছিল না ৫ **সুকুমার রায়ের** সুকুমার সাহিত্য সমগ্র ১ম ২৫ ২য় ৩০ জীবজন্তু ৮ সমগ্র শিশুসাহিত্য ১০ **বুদ্ধদেব গুহর** ঋজুদার সঙ্গে জঙ্গলে ৫ মউলির রাত ৫ **ননীগোপাল চক্রবর্তীর** চরকাবুড়ি ৪ যাদুঘরে চল যাই ৬ **মতি নন্দীর** ননীদা নট আউট ৫ স্ট্রাইকার ৬ স্টপার ১০ কোনি ৭ **বিমল করের** ওআণ্ডার মামা ৬ কাপালিকরা এখনও আছে ৭ রাজবাড়ির ছোরা ও হারানো জীপের রহস্য ১০ **নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও বিমল দাসের** সাদা বাঘ ১০ **অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর** শাদা ঘোড়া ৮ **অজেয় রায়ের** ফেরোমন ৬ **শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের** মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি ৬ **গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু ও ময়ূখ চৌধুরীর** নিশীথ রাতের আহ্বান ৩ **গৌরকিশোর ঘোষের** দুষ্টুর দুপুর ৪ **আনন্দ বাগচীর** বনের খাঁচায় ৬ **মনোজ বসুর** ওস্তাদ নটবর ৬ **শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের** ক্লাস সেভেনের মিস্টার ব্রেক ৪ **শিশির করের** গঙ্গায় বাঘ ৪ **লীলা মজুমদারের** বাতাসবাড়ি ৫ **অমরনাথ রায়ের** দেশ বিদেশের বিজ্ঞানী ১০ **আশাপূর্ণা দেবীর** রাজকুমারের পোশাকে ৪ **সমরেশ বসুর** মোক্তারদাদুর কেতুবধ ৬ **অমিতাভ চৌধুরীর** তেপান্তরের মাঠে ৪ **গিরিধারী কুণ্ডুর** টংসা চু ৫ **বিমল মিত্রের** রাজা হওয়ার ঝকমারি ৮ **শিশিরকুমার মজুমদারের** তুফান দরিয়ার পরান মাঝি ৫ **অন্নদাশংকর রায়ের** হৈ রে বাবুই হৈ ৫ **মঞ্জিল সেনের** ডাকাবুকো ৫ **রেবন্ত গোস্বামীর** অরুমিতুদের কথা ৪ **সুবোধ ঘোষের** সেই অদ্ভুত অভ্রধনি ৫ **সত্যজিৎ রায়ের** নানা স্বাদের কাহিনী : এক ডজন গপ্পো ১০ আরো এক ডজন ১০ ফটিকচাঁদ ৮ **শিবরাম চক্রবর্তীর** হর্ষবর্ধর নিত্যনূতন ৪ শিব্রামের বারো আড়ি ৫ দিগ্বিজয়ী হর্ষবর্ধন ৬ **পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের** মাধুরীলতার চিঠি ৫ **নারায়ণ চক্রবর্তীর** হলদে সবুজ ক্রিস্ট্যাল ১০ **পূর্ণেন্দু পত্রীর** কী করে কলকাতা হলো ৫ ছড়ায় মোড়া কলকাতা ৪

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৯
ফোন ৩৪ ৪৩৬২

আমার প্রিয় নেড়ি

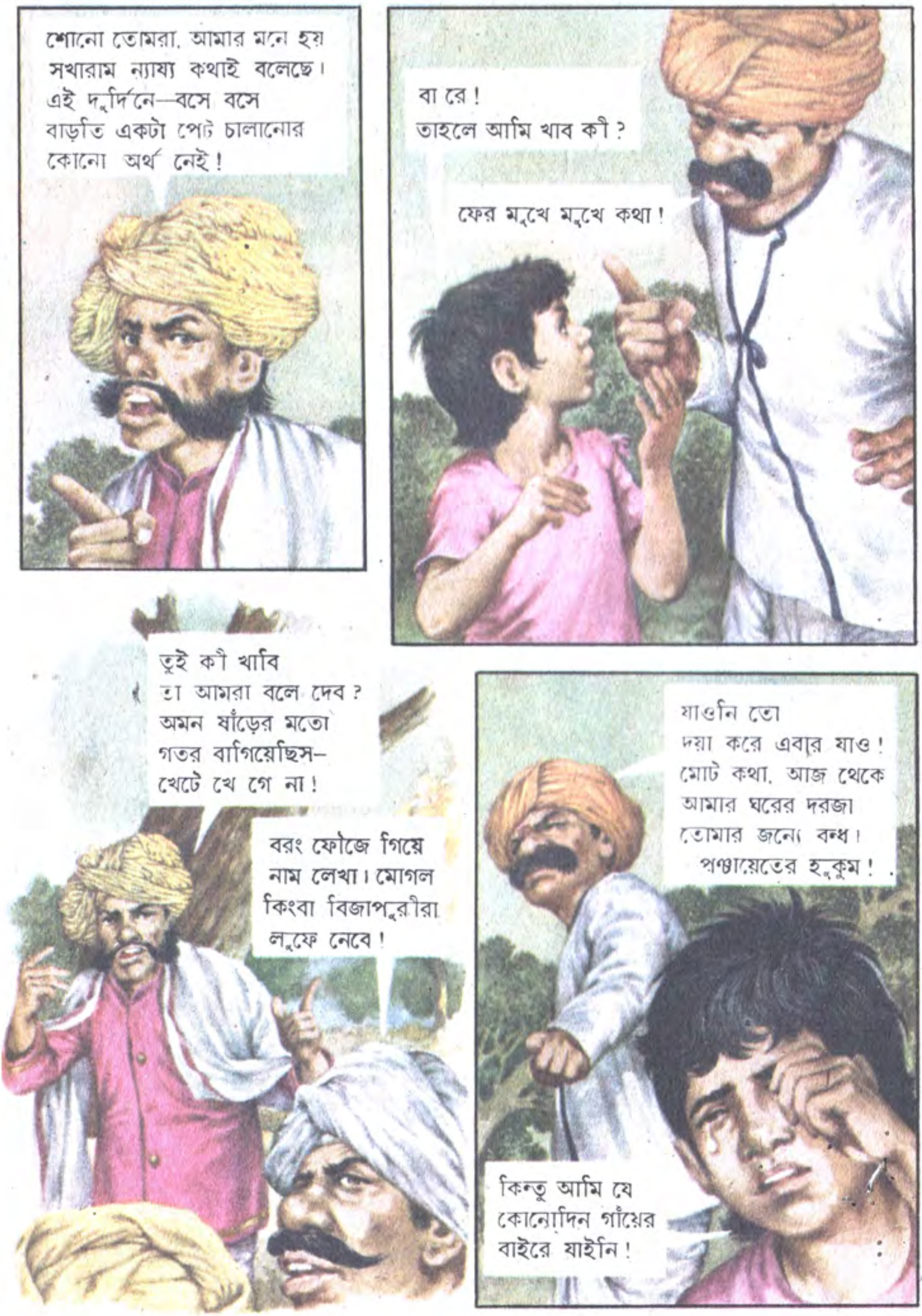
শক্তি চট্টোপাধ্যায়

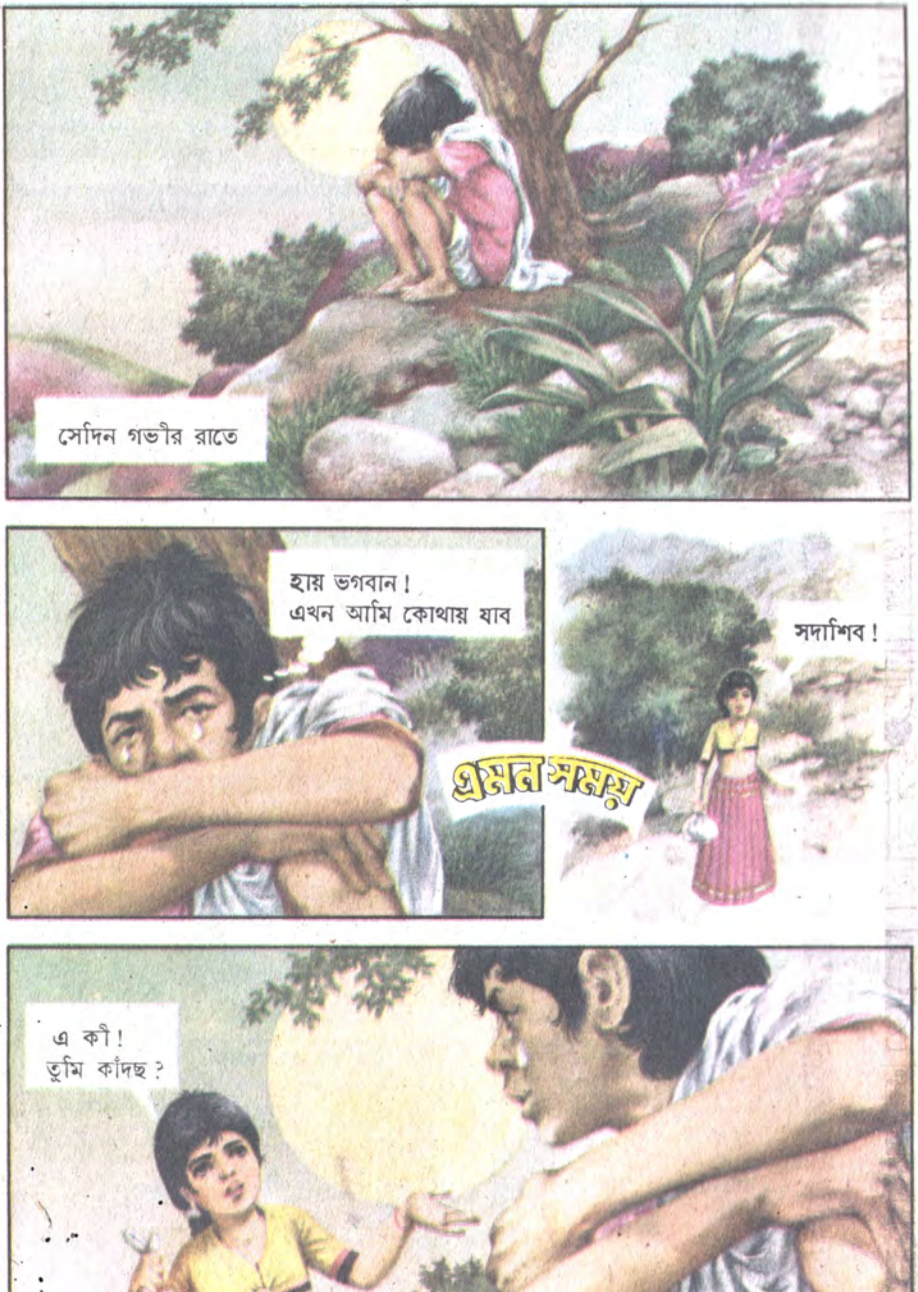
সবাই বলে, নেড়িকুত্তোর গায়ে ধুত্তোর
রেড়ির তেলের গন্ধ!
দুধ না খেয়ে চিবোয় পশম, কুত্তো কসম,
দেখতে খুবই সুন্দর।
মা বলে, ঠিক কামড়ে দেবে, আমড়া বনে
কাষ্ঠকুটুম পিমড়ে,
তাতার বলে, মাগ্‌গি ভাতার বর্ধিত হার
ফুলকো নুচি চিমড়ে।
মাগ্‌না পেলুম নেলী-শেলী, আর পেয়েচি
লোহার চেনের বন্ধন,
তাও তো বলো, নেড়িকুত্তোর গায়ে ধুত্তোর
রেড়ির তেলের গন্ধ!
তোমরা পুজো-আচ্চা করো, ধূপধুনো দাও
আমার তো হয় দমছুট,
কইতে আসি কিচ্ছুটি কি? চুপ মেরে যাই
দাও না গুঁড়ো বিসকুট।
ওরা আমার বল চিবুল, আমার তো বল
নয় ঠাকুমার পুঁটলি,
ওদের পানে তাকিয়ে দ্যাখো, কষ্ট পাবে
তা নয় বকতে জুটলে!
বড়দের এই খুনসুটি-ভাব কোন্ ছোটতে
মানতে যাবে দৈনিক?
আমার হল পরীক্ষা-শেষ, সেইভাবে চায়,
খাতা এবং বই নিক॥



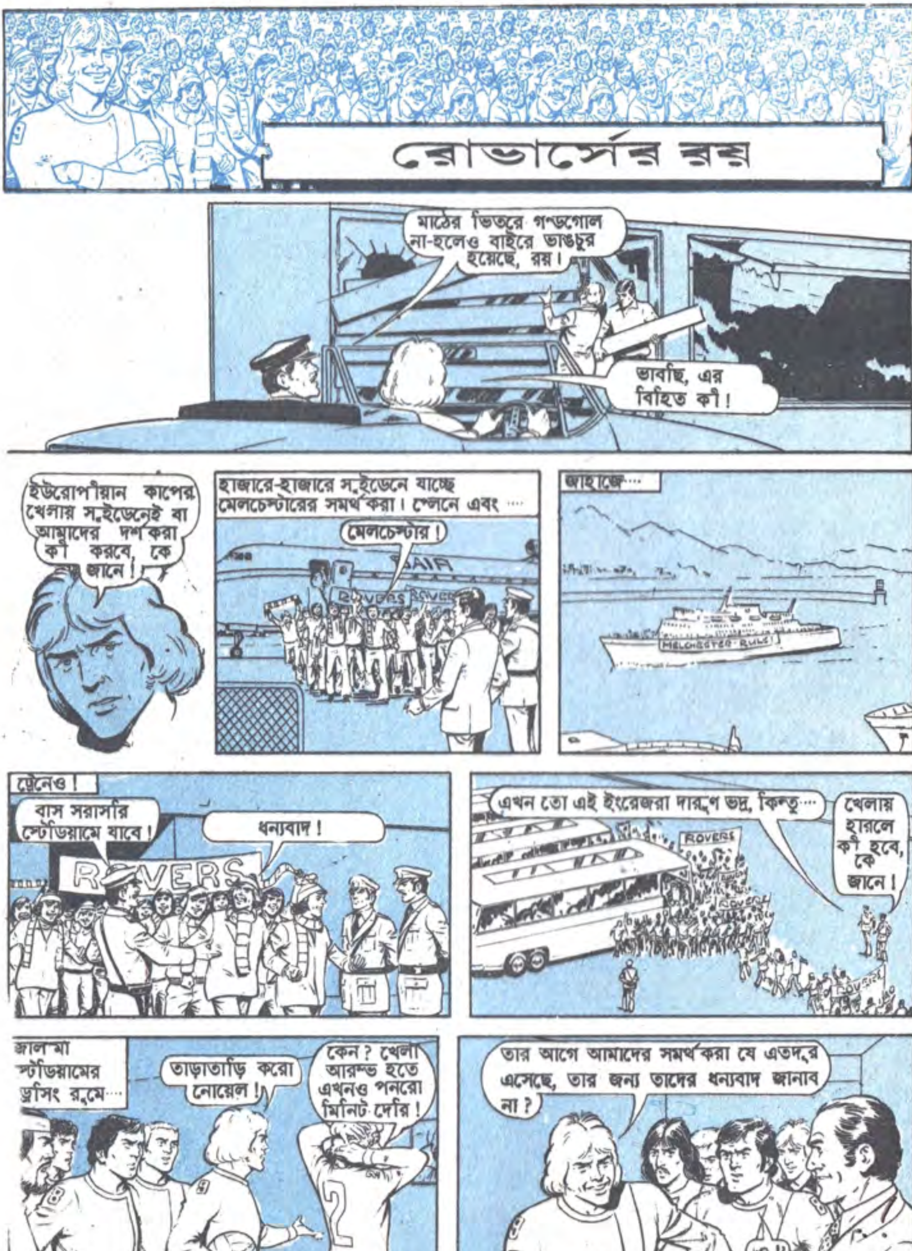
ছবি দেবাশিস দেব

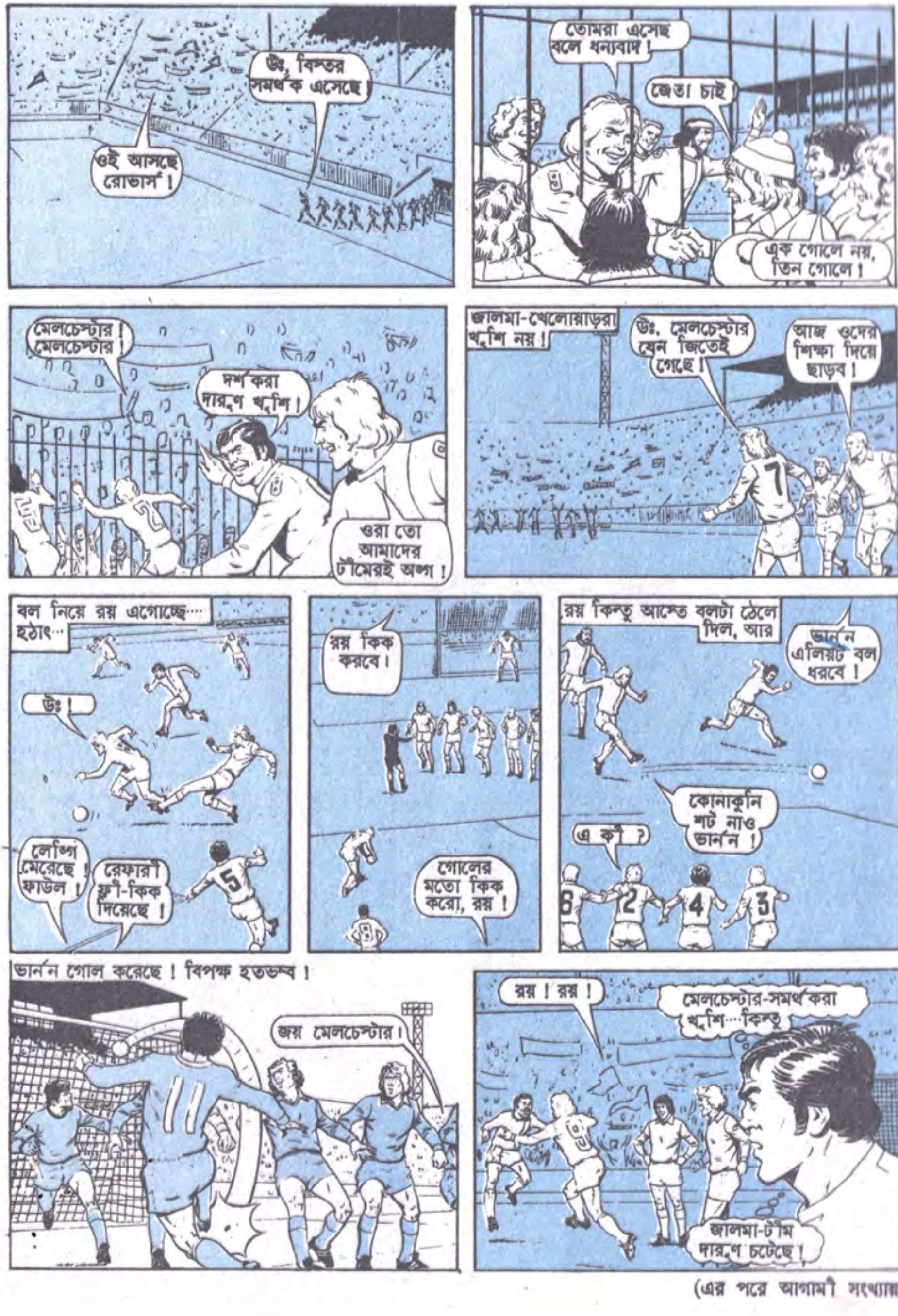
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় **সদাশিব** আদিকাণ্ড চিত্রনাট্য : তরুণ মজুমদার
ছবি : বিমল দাশ





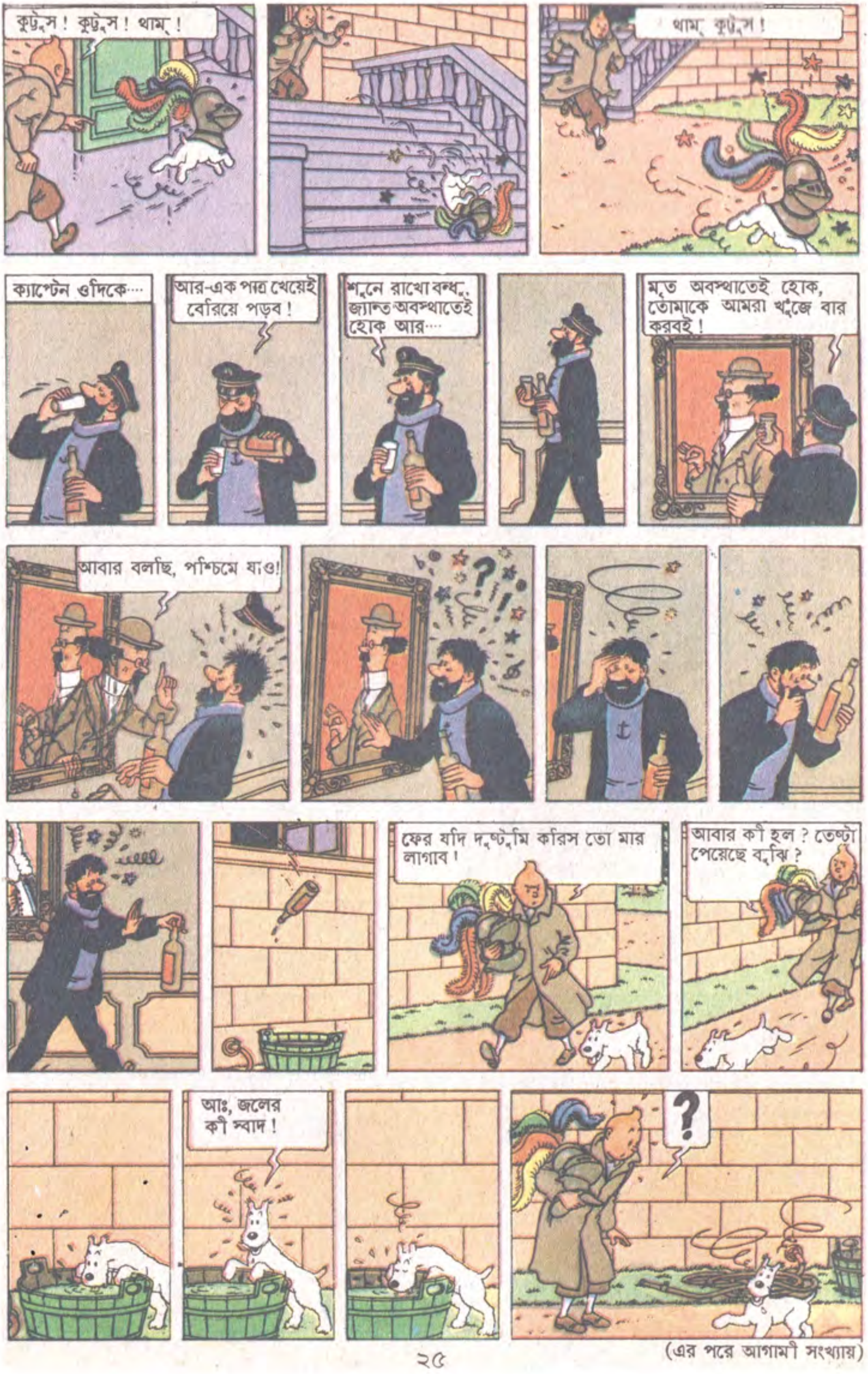
(এর পরে আগামী সংখ্যায়)


রোভার্সের রয়
মাঠের ভিতরে গণ্ডগোল না-হলেও বাইরে ভাঙচুর হয়েছে, রয়।
ভাবছি, এর বিহিত কী!
ইউরোপীয়ান কাপের খেলায় সুইডেনেই বা আমাদের দর্শকরা কী করবে, কে জানে!
হাজারে-হাজারে সুইডেনে যাচ্ছে মেলচেস্টারের সমর্থকরা। প্লেনে এবং ···
মেলচেস্টার!
ROVERS
জাহাজে···
MELCHESTER RULES
ট্রেনেও!
বাস সরাসরি স্টেডিয়ামে যাবে!
ধন্যবাদ!
ROVERS
এখন তো এই ইংরেজরা দারুণ ভদ্র, কিন্তু···
খেলায় হারলে কী হবে, কে জানে!
ROVERS
জাল্মা স্টেডিয়ামের ড্রেসিং রুমে···
তাড়াতাড়ি করো নোয়েল!
কেন? খেলা আরম্ভ হতে এখনও পনেরো মিনিট দেরি!
তার আগে আমাদের সমর্থকরা যে এতদূর এসেছে, তার জন্য তাদের ধন্যবাদ জানাব না?
ও!

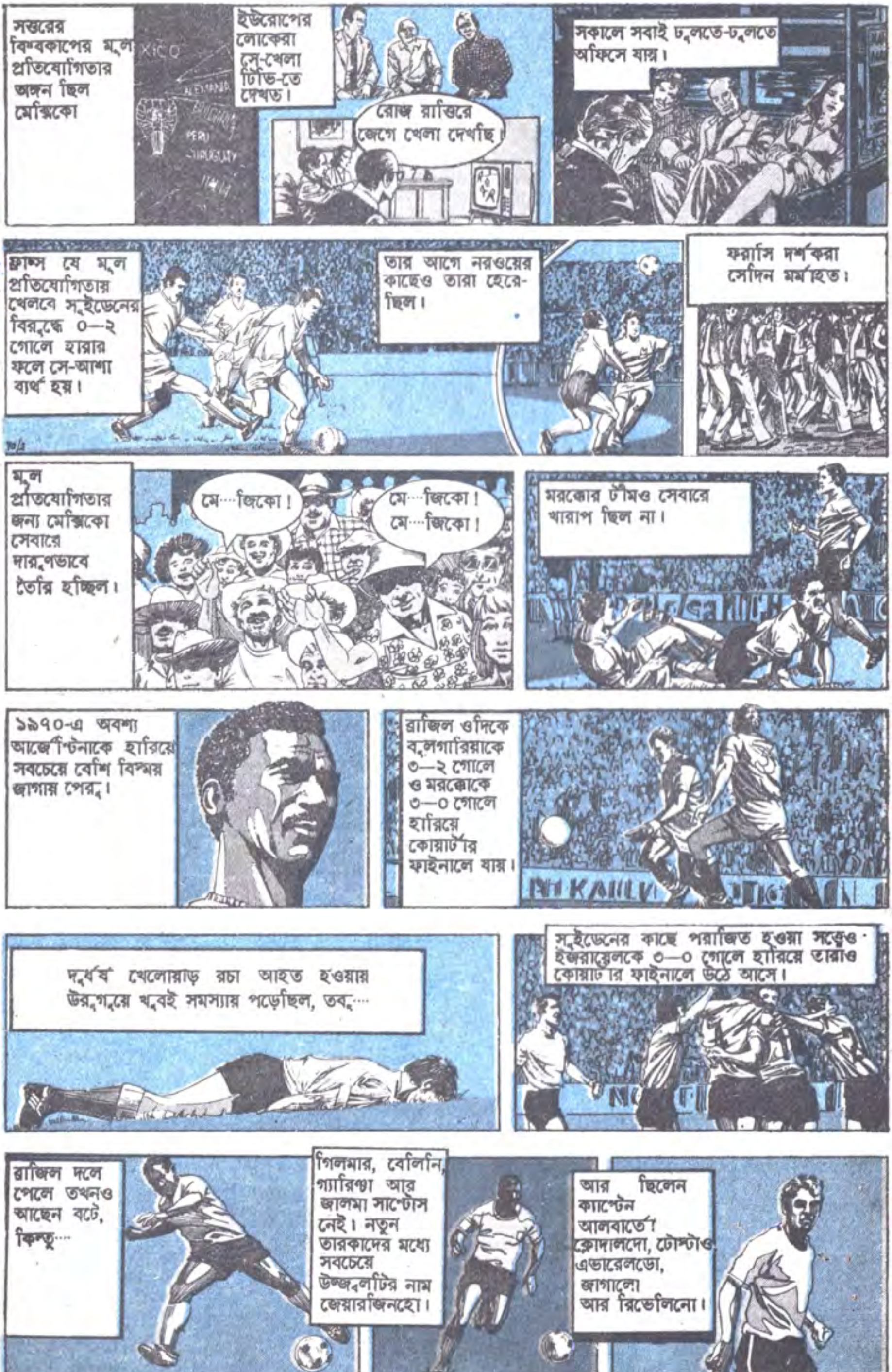


(এর পরে আগামী সংখ্যায়)


ক্যাপ্টেন! ক্যাপ্টেন!
দড়াম
ক্যাপ্টেন! ক্যাপ্টেন!
উত্তর নেই! তাহলে কি চাবির ফ্রটো দিয়ে...
হ্যাঁ, হ্যাঁ, উঁকি দাও!
কী, কিছু দেখতে পাচ্ছ?
না!
?
চলো!
কোথায় যাব?
এক পাত্র খেয়েই পথে বেরিয়ে পড়ব!
!
ভৌ ভৌ!
কুট্টুস, এদিকে আয়
ভৌ ভৌ!
!
?!?
কী হচ্ছে কুট্টুস?



(এর পরে আগামী সংখ্যায়)



(এর পরে আগামী সংখ্যায়)



পাহাড়-চূড়ায় আতঙ্ক

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

[আগে যা ঘটেছে : সন্তু আর কাকাবাবু এবার অভিযানে এসেছেন হিমালয়ে, এভারেস্ট-চূড়ার দিকে। বেস-ক্যাম্প ছেড়ে সামনের দিকে এগোতে গিয়ে শেরপা আর মালবাহকেরা হঠাৎ ভয় পেয়ে পালাল। তাদের ধারণা, তারা ইয়েতির মতন বিশাল কোনো জন্তু দেখেছে কাকাবাবু আর সন্তু আশ্রয় নিল একটা গম্বুজে। কে বা কারা যেন বাইরে থেকে বন্ধ করে দিল সেই গম্বুজের দরজা। উদ্ধার পাবার জন্য কাকাবাবু ওয়্যারলেস সেটে খবর পাঠালেন নেপালের একটি শহরে। দুজন অফিসার হেলিকপটারে করে এসে উদ্ধার করলেন তাঁদের। তারপর ইয়েতির রহস্য সন্ধানে তাঁরা যখন সামনের দিকে এগোচ্ছেন, এই সময় হঠাৎ পেছন থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন কাকাবাবু। বরফের ওপর পড়ে আছে তাঁর একখানা ক্রাচ আর টাট্‌কা রক্ত। তারপর—]

॥ ১৪ ॥

ভার্মার মুখ দেখে মনে হল, জীবনে তিনি এ-রকম অবাক কখনো হননি। চোখ দুটো একেবারে স্থির হয়ে গেছে। ফিসফিস করে তিনি বললেন, "এ কী ব্যাপার? মিঃ রায়চৌধুরী কোথায় গেলেন?"

রানা বললেন, "স্ট্রেঞ্জ! ভেরি স্ট্রেঞ্জ! এই তো আমাদের পেছনেই ছিলেন, খানিকটা আগেই দেখতে পাচ্ছিলাম! কোনো কারণে উনি কি গম্বুজে ফিরে গেলেন?"

ভার্মা বললেন, "তা কী করে হবে? এত তাড়াতাড়ি উনি কী করে ফিরে যাবেন? উনি কি দৌড়তে পারেন? তা ছাড়া আমাদের না বলে যাবেনই বা কেন?"

ভার্মা এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন বরফের ওপর পড়ে থাকা ক্রাচটার দিকে।

রানা বললেন, "উনি ক্রাচ ছাড়া হাঁটবেনই বা কী করে? ওখানে রক্তই বা পড়ে আছে কেন? কিছুই বুঝতে পারছি না যে!"

সন্তুও এত অবাক হয়ে গেছে যে, কোনো কথা বলতে পারছে না। বিশেষত রক্ত দেখে তার বুকটা কাঁপছে।

মিংমা হঠাৎ খুব জোরে চিৎকার করে উঠল, "আংকল সাব! আংকল সাব!"

জায়গাটা এমনই নিস্তব্ধ যে, মিংমার চিৎকারে যেন সেই স্তব্ধতা ফেটে একেবারে ঝনঝন করতে লাগল। বহু দূরে প্রতিধ্বনি, যেন তিনদিক থেকে মিংমাকে ভেংচিয়ে কেউ বলতে লাগল, আংকল সাব, আংকল সাব!

মিংমা আরও দু'বার ডাকতেই রানা বললেন, "থাক, আর চিৎকার করতে হবে না। মিঃ রায়চৌধুরী কি আমাদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলবেন নাকি?"

ভার্মা বললেন, "ইয়েতি অদৃশ্য হতে পারে, এ-কথা আমিও শুনেছি। কোনো ইয়েতি এসে যদি মিঃ রায়চৌধুরীকে ধরে নিয়ে যায়..."

রানা বললেন, "ইয়েটি? আপনিও ইয়েটিতে বিশ্বাস করেন?"

ভার্মা বললেন, "তা ছাড়া আর কী ব্যাখ্যা হতে পারে বলুন? এই জন্যই আমি তখন মিঃ রায়চৌধুরীকে বলেছিলাম, মাত্র এই ক'জন লোক নিয়ে এখন কালাপাথরের দিকে যাবার দরকার নেই।"

মিংমা এই সময় বরফের ওপর শুয়ে পড়ে গিরগিটির মত আস্তে আস্তে এগোতে লাগল কাকাবাবুর ক্রাচটার দিকে।

ভার্মা বললেন, "ও কী? ও-রকম করছে কেন?"

রানা বললেন, "ও দেখতে চাইছে, ওখানে কোনো ক্রিভাস আছে কিনা। একমাত্র চোরা কোনো ক্রিভাসের মধ্যে পা দিয়ে মিঃ রায়চৌধুরী নীচে ডুবে যেতে পারেন।"

ভার্মা যেন নিজের অজান্তেই ভয় পেয়ে কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন, "আমরাও তো ঐখান দিয়েই এসেছি!"

রানা বললেন, "অনেক সময় ছোট-ছোট ক্রিভাস থাকে, ঠিক সেটার ওপর পা দিলেই বিপদ! মিংমা ঠিক কাজই করেছে, শুয়ে থাকলে হঠাৎ তলিয়ে যাবার ভয় থাকে না।"

সন্তু বলল, "রক্ত! ওখানে রক্ত কী করে আসবে? বরফের ওপর পড়ে গেলে তো বেশি জোর লাগে না? রক্তও বেরোবে না।"

ভার্মা বললেন, "ঠিক বলেছ, সন্তু, রক্ত কী করে এল?"

মিংমা একটু-একটু করে এগিয়ে গিয়ে ক্রাচটাকে ধরে ফেলল। তারপর বরফের ওপর

চাপড় মারতে লাগল জোরে জোরে। গুঁড়ো গুঁড়ো বরফ ছেটকাতে লাগল সেই আঘাতে, কিন্তু স্পষ্ট বোঝা গেল সেখানকার বরফের মধ্যে কোনো গর্ত-টর্ত নেই।

মিংমা আশেপাশের খানিকটা জায়গাও চাপড়ে দেখল ঐ একরকমভাবে, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে নিরাশ গলায় বলল, "নেহি সাব! ইধার কিরভাস নেহি!"

রানা বললেন, "আশ্চর্য! একটা মানুষ কি অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে?"

ভার্মা বললেন, "ব্যাপারটা মোটেই আমার ভাল ঠেকছে না। আমাদের আর বেশিক্ষণ এখানে থাকা ঠিক নয়।"

রানা বললেন, "আমরা কি ফিরে যাব বলতে চান? মিঃ রায়চৌধুরীর খোঁজ না করেই? ইণ্ডিয়া গভর্নমেণ্টের বিশেষ রিকোয়েস্ট আছে, যাতে আমরা ওঁর নিরাপত্তার ভার নিই।"

ভার্মা বললেন, "আর কীভাবে খোঁজ করবেন? চারদিকে ধু-ধু করছে বরফ। এখানে কোনো মানুষের পক্ষে লুকিয়ে থাকা সম্ভব নয়। আর মিঃ রায়চৌধুরীর মতন একজন খোঁড়া লোক দৌড়েও কোথাও চলে যেতে পারেন না। তাহলে তিনি গেলেন কোথায়?"

রানা বললেন, "সেটাই তো প্রশ্ন। তিনি গেলেন কোথায়? একটা না একটা ব্যাখ্যা এর নিশ্চয়ই আছে!"

ভার্মা বললেন, "দেখুন, শেক্সপীয়ারের হ্যামলেটের সেই লাইনটা আমার মনে পড়ছে। 'দেয়ার আর মোর থিংস ইন হেভ্‌ন অ্যাণ্ড আর্থ, হোরেশিও, দ্যান আর ড্রেম্‌ট অব ইন ইওর ফিলসফি!' আপনারা যা-ই বলুন, বাতাসে মাটিতে এখনো এমন রহস্য আছে, যা মানুষের অজানা!"

রানা বললেন, "সে কী, মিঃ ভার্মা! আপনি কি অলৌকিক ব্যাপারে বিশ্বাস করেন নাকি?"

এ-কথার কোনো উত্তর না দিয়ে ভার্মা হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন বরফের ওপর। তারপর হাতজোড় করে কী যেন মন্ত্র পড়তে লাগলেন।

একটু বাদে তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "আমার ভীষণ শীত করছে। আমি আর এখানে থাকতে পারছি না। চলুন, গম্বুজটার কাছে ফিরে যাই।"

রানা কী-রকম যেন হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। আপন মনে বললেন, "গম্বুজের কাছে ফিরে যাব? মিঃ রায়চৌধুরীর কী হবে?"

ভার্মা বললেন, "গম্বুজের কাছে ফিরে গিয়ে দেখা যাক। কোনো কারণে বা যে-কোনো উপায়ে উনি তো সেখানে যেতেও পারেন! হয়তো কোনো দরকারি জিনিস ফেলে এসেছিলেন।"

রানা বললেন, "গম্বুজটা কত দূরে! উনি অতদূরে ফিরে গেলেন, আর আমরা টেরও পেলাম না?"

ভার্মা এবার একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, "উনি আমাদের সামনে কোথাও যাননি, এ কথা তো ঠিক? ওঁকে খুঁজতে হলে আমাদের পেছনের দিকেই খুঁজতে হবে। আমার অসম্ভব শীত করছে। পা দুটো যেন জমে যাচ্ছে একেবারে। আর বেশিক্ষণ এখানে থাকলে আমিও মরে যাব!"

সন্তু রানার মুখের দিকে চেয়ে বলল, "আমি একটা কথা বলব?"

রানা বললেন, "কী?"

ভার্মা বললেন, "চলো, গম্বুজের মধ্যে চলো, সেখানে বসে তোমার কথা শুনব।"

সন্তু বলল, "আমি একবার একটা ক্রিভাসের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলাম! ঐ মিংমা আমায় টেনে তুলেছিল।"

মিংমা বলল, "হাঁ সাব!"

সন্তু বলল, "আমি অনেকখানি ঢুকে গিয়েছিলাম বরফের মধ্যে। তারপর...একটা অদ্ভুত জিনিস মনে হয়েছিল। আমার পা কিসে যেন ঠেকে গেল। একটা শক্ত কিছুতে। আমার ধারণা, সেটা একটা লোহার পাত।"

ভার্মা এবং রানা দু'জনেই এক সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন, "কী?"

সন্তু বলল, "লোহার পাত।"

ভার্মা ঠাট্টার হাসি হেসে বললেন, "বরফের নীচে লোহার পাত? তোমার কি মাথা-টাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি?"

রানা আগ্রহ দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কী করে বুঝলে লোহার পাত? পাথরও তো হতে পারে। বরফের খানিকটা নীচে তো পাথর থাকবেই!"

সন্তু বলল, "পায়ের তলায় পাথর ঠেকলে একরকম লাগে। আর লোহার পাতের মতন প্লেন কোনো জিনিস ঠেকলে অন্যরকম লাগে। আমার সেই অন্যরকম লেগেছিল।"

ভার্মা বললেন, "লোহার ঝনঝন শব্দ হয়েছিল?"

সন্তু মাথা নিচু করে বলল, "তা অবশ্য হয়নি। কিংবা হলেও আমি শুনতে পাইনি। শুধু আমার অন্যরকম লেগেছিল।"

রানা জিজ্ঞেস করল, "সে জায়গাটা কোথায়?"

সন্তু আঙুল তুলে বলল, "সে-জায়গাটা এখানে নয়। ঐ দিকে। সেখানে একটা কাঠির ওপর একটা লাল রুমাল বেঁধে রেখেছিল মিংমা। হয়তো খুঁজলে সে-জায়গাটা বার করা যেতে পারে।"

ভার্মা বললেন, "আমরা শুধু এখানে সময় নষ্ট করছি। এদিকে হয়তো মিঃ রায়চৌধুরী কোন কারণে আহত হয়ে গম্বুজে ফিরে গিয়ে বিশ্রাম করছেন। ধরা যাক, সন্তু যেখানে বরফে ডুবে গিয়েছিল, সেখানে বরফের নীচে একটা লোহার পাত পড়ে আছে। কেউ-না-কেউ হয়তো কখনো ফেলে গিয়েছিল। তার সঙ্গে এখানকার রহস্যটার সম্পর্ক কী? অ্যাঁ?"

সন্তু বলল, "কাকাবাবুর মুখে শুনেছি, কেইন শিপটন নামে একজন অভিযাত্রী এই রকম জায়গা থেকে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলেন। কাকাবাবু তাঁর খোঁজেই এসেছেন। তারপর কাকাবাবুও সেই জায়গা থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। এর মধ্যে কোনো যোগাযোগ থাকতে পারে না?"

ভার্মা বললেন, "এর মধ্যে আবার কেইন শিপটনের কথা এল কী করে? কে বলল, মিঃ রায়চৌধুরী কেইন শিপটনের খোঁজ করতে এখানে এসেছিলেন? কেইন শিপটন বিদেশী, তিনি নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিলেন নেপালে। এ নিয়ে ভারত সরকার মাথা ঘামাবে কেন? তোমার কাকাবাবু ইয়েতির রহস্য সম্বন্ধে গবেষণা করবেন বলে ভারত সরকারের সাহায্য চেয়েছিলেন। ইয়েতি

সম্পর্কে আমার একটা থিয়োরি আছে, চলুন, গম্বুজে ফিরে গিয়ে বলব!''

রানা সন্তুর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কী বলতে চাইছিলে?"

সন্তু বলল,"যেখানে রক্ত পড়ে আছে, ঐ জায়গার বরফটা একটু খুঁড়ে দেখলে হয় না? যদি ওর নীচে কিছু থাকে? ক্রাচ ছাড়া কাকাবাবুর পক্ষে তো কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়!''

ভার্মা বললেন, মিংমা তো দেখল যে ওখানকার বরফ শক্ত তার নীচে তোমার কাকাবাবু যাবেন কী করে? মিছিমিছি বরফ খুঁড়ে লাভ নেই কোনো। চলুন, মিঃ রানা, গম্বুজের দিকে চলুন, আমি আর থাকতে পারছি না।"

রানা গম্ভীরভাবে বললেন, "আপনার যদি খুব শীত করে তাহলে আপনি গম্বুজের দিকে এগোন, মিঃ ভার্মা। এই ছেলেটি যখন বলছে, তখন বরফ খুঁড়েই দেখা যাক। মিঃ রায়চৌধুরীর জন্য সব রকমের চেষ্টা করতে আমরা বাধ্য।"

ভার্মা বললেন, "আকাশের অবস্থাটা একবার দেখুন!"

সবাই ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখল সত্যিই আকাশের অবস্থা হঠাৎ আবার বদলে গেছে। কী সুন্দর ঝকঝকে রোদ ছিল কিছুক্ষণ আগেও। এখন কালো-কালো মেঘ উড়ে আসছে যেন কোথা থেকে। যে-কোনো সময় বৃষ্টি নামতে পারে। অথবা ঝড় ওঠাও আশ্চর্য কিছু নয়। ঝড়ের মধ্যে বাইরে এরকমভাবে থাকা বেশ বিপজ্জনক।

মিংমা তার কাঁধের ঝোলা থেকে একটা গাঁইতি বার করে বলল, "আমি ঝটপট খুঁড়ে দেখছি, সাব। বেশি টাইম লাগবে না।"

বলা মাত্রই সে ঝপাঝপ কোপ মারতে লাগল বরফের মধ্যে। দারুণ মজবুত মিংমার শরীর, তার হাত চলল একেবারে যন্ত্রের মতন। সন্তু তার খুব কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

দেখতে-দেখতে মিংমা অনেকখানি গর্ত খুঁড়ে ফেলল। ভার্মা আর রানা এসে সেই গর্তের মধ্যে উঁকি দিলেন। দু'জনেরই মুখে সন্দেহ। সত্যিই একজন মানুষ এতখানি শক্ত বরফের মধ্যে তলিয়ে যাবেন কী করে।

এক সময় মিংমার গাঁইতিতে ঠং করে শব্দ হল, আর সন্তু চমকে উঠল সঙ্গে-সঙ্গে।

মিংমা আরও দু'তিনবার গাঁইতি চালিয়েই থেমে গেল। এত ঠান্ডার মধ্যেও পরিশ্রমে তার কপালে ঘাম জমেছে। বাঁ হাত দিয়ে ঘাম মুছে সে সন্তুর দিকে তাকিয়েই করুণ গলায় বলল, "লোহার পাত না আছে, সন্তু সাব। পাত্থর হ্যায়, পাত্থর!"

নিচু হয়ে সে এক টুকরো পাথর তুলে আনল।

ভার্মা বললেন, "বলেছিলাম না, নিছক পণ্ডশ্রম!"

রানা বললেন, "তাই তো!"

ভার্মা বললেন, "আর দেরি করবেন না, ঝড় উঠবে, শিগগির চলুন!"

রানা বললেন, "হ্যাঁ, আর এখানে থাকার কোনো মানে হয় না। চলুন, যাওয়া যাক!"

মিংমা সন্তুর হাত ধরে বলল, "চলো সন্তু সাব!"

সন্তু খুব জোরে নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরল। লোকজনের সামনে সে কখনও কাঁদতে চায় না। কিন্তু তার মনে হল, তারা যেন কাকাবাবুকে এখানে অসহায় অবস্থায় ফেলে রেখে চলে যাচ্ছে। অথচ, ঝড়ের মধ্যে এখানে দাঁড়িয়ে থাকাও যাবে না।

ঝড় তখনই উঠল না বটে, কিন্তু আকাশটা ক্রমশ বেশি কালো হয়ে আসতে লাগল। ওরা সবাই মিলে ফিরে চলল গম্বুজের দিকে।

ভার্মা বললেন, "ঝড় উঠলে আরও কী বিপদ হবে জানেন? হেলিকপ্টারটা ফিরতে পারবে না! তাহলে সারা রাত আমাদের ঐ ভুতুড়ে গম্বুজটার মধ্যে থাকতে হবে! ওরে বাপরে বাপ! এখানে সত্যিই ভুতুড়ে কাণ্ড ঘটছে!"

আর কেউ কোনো কথা বলল না। প্রায় চল্লিশ মিনিট হেঁটে ওরা এসে পৌঁছোল গম্বুজটার কাছে। মিংমা দৌড়ে গিয়ে গম্বুজটার ভেতরে ঢুকে পড়ল।

একটু পরেই গম্বুজের ওপরের জানালার কাছে দাঁড়িয়ে মিংমা বলল, "নেহি সাব! আংকল সাব ইধার ভি নেহি হ্যায়!"

রানা বললেন, "যাঃ, শেষ আশাটাও গেল!"

প্রায় তক্ষুনি ফট-ফট শব্দ পাওয়া গেল আকাশে। হেলিকপটারটা ফিরে আসছে। ভার্মা বললেন, "বাঃ, চমৎকার! তা হলে রাত্রে এখানে থাকতে হবে না। চলুন, চলুন, আর দেরি করবেন না।"

সন্তু বলল, "আমরা এখান থেকে চলে যাব?"

ভার্মা বললেন, "হ্যাঁ। আমি চলে যেতে চাইছি বলে কি তোমরা আমাকে ভিতু ভাবছ? যে-শত্রুকে চোখে দেখা যায়, তার সঙ্গে লড়তে আমি কখনো ভয় পাইনি। কিন্তু অদৃশ্য শত্রুর সঙ্গে লড়াই করতে আমি জানি না। তোমার কাকাবাবু যে মিসিং, সে খবর ভারত সরকারকে এক্ষুনি জানাতে হবে। তারপর বড় সার্চ পার্টি এনে খুঁজতে হবে তাঁকে।"

রানা চিন্তিতভাবে বললেন, "আপনি ঠিকই বলেছেন। এখানে আর থেকে কোনো লাভ নেই। ঝড় আসবার আগেই আমাদের ওড়া উচিত।"

সন্তু হঠাৎ বলল, "আমি যাব না!"

ভার্মা বললেন, "তুমি যাবে না?"

সন্তু ওদের থেকে খানিকটা দূরে সরে গিয়ে গোঁয়ারের মতন বলল, "আমি কিছুতেই যাব না! কিছুতেই না!"

তারপর ওঁরা দু'জনে অনেক করে বোঝাবার চেষ্টা করলেন সন্তুকে। সন্তু কিছুতেই রাজি নয়। সার্চ পার্টি তো আসবেই, ততদিন পর্যন্ত সন্তু এই গম্বুজের মধ্যে অপেক্ষা করবে!

ভার্মা বললেন, "ছেলেটা পাগল হয়ে গেছে নাকি? একা এখানে থাকবে!"

মিংমা বলল, "আমি সন্তু সাবের সঙ্গে থাকতে পারি।"

শেষ পর্যন্ত সেই ব্যবস্থাই হল। আর দেরি করার উপায় নেই বলে রানা আর ভার্মা উঠে পড়লেন হেলিকপটারে। ওদের বললেন, গম্বুজের লোহার দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিতে। কাল সকালেই আবার হেলিকপটারটা ফিরে আসবে।

প্রবল গর্জন করে আবার হেলিকপটারটা উঠে গেল ওপরে। গম্বুজের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইল সন্তু আর মিংমা। (ক্রমশ)

মণিমেলার খবর

কেন্দ্রীয় সমাচার

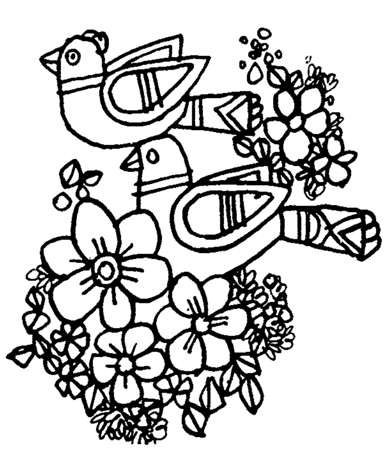
আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে রবীন্দ্র সরোবরে ২৯ থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন আঞ্চলিক মণিমেলার গান, ব্যায়াম, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা চলচ্চিত্র প্রদর্শনী ইত্যাদির ব্যবস্থা হয়েছিল। বিশেষ অনুষ্ঠানসূচীর মধ্যে ছিল প্রতিবন্ধী শিশুদের বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, অন্ধ শিশুদের সঙ্গীত প্রতিযোগিতা, অনাথ শিশুদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং কিশোরদের রচনা প্রতিযোগিতা।

আঞ্চলিক সংবাদ

প্রথামুক্ত পদ্ধতিতে শিক্ষিত কর্মীরা বিভিন্ন আঞ্চলিক কেন্দ্রে মোট ২০টি শিক্ষণকেন্দ্র খুলেছেন বঞ্চিত শিশুদের জন্য। স্থানীয় চিকিৎসকদের সহায়তায় নিম্ন আয়ের পরিবারের শিশুদের জন্য চিকিৎসাকেন্দ্র খোলা হয়েছে কয়েকটি আঞ্চলিক কেন্দ্রে। এইসব কেন্দ্রে শিশুরা বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগ পাবে।

মণিসন্দেশ

১৪ নভেম্বর শিশুদিবস উপলক্ষে বিভিন্ন মণিমেলা শোভাযাত্রা, খেলাধুলো, নাচগান, ব্রতচারী নৃত্য ইত্যাদিব আয়োজন করেছিল। কয়েকটি মণিমেলায় পরীক্ষার্থীদের জন্য অবৈতনিক বিদ্যালয় খোলা হয়েছে।



বিদুরের খুদ

বন্দনা গুপ্ত



অশ্রদ্ধার রাজভোগের চেয়ে বিদুরের খুদও ভাল—এমনি একটি কথা প্রায়ই শোনা যায় লোকের মুখে। শুনেই বোঝা যায়, মহাভারতের কোনো একটি কাহিনী থেকেই এই কথাটির জন্ম।

বিদুর মহাভারতের একটি বিশিষ্ট চরিত্র। যমরাজ এক মুনির অভিশাপে ধৃতরাষ্ট্র ও পান্ডুর ভাই হয়ে জন্মেছিলেন। তিনি ছিলেন পরম পণ্ডিত ও অত্যন্ত ধার্মিক।

অজ্ঞাতবাসের পরে পান্ডবগণ যখন আবার হস্তিনায় ফিরে এলেন তখন দুর্যোধন বিনা যুদ্ধে তাঁদের রাজ্য ফিরিয়ে দিতে রাজি হলেন না। শ্রীকৃষ্ণ তখন দুর্যোধনকে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত করার জন্যে হস্তিনায় যাবেন ঠিক করলেন।

শ্রীকৃষ্ণ আসছেন শুনে আনন্দিত ভীষ্ম, দ্রোণ দুর্যোধনকে বললেন, সে যেন শ্রীকৃষ্ণের সাদর অভ্যর্থনার আয়োজন করে। দুর্যোধন প্রথমে আপত্তি করেছিলেন, পরে বললেন, "বেশ তাই হবে।" তিনি শ্রীকৃষ্ণকে এমন অভ্যর্থনা জানাবেন যে, তাঁর সহায় না হয়ে শ্রীকৃষ্ণের উপায় থাকবে না। তারপর তিনি শিল্পীদের আদেশ দিলেন বহুমূল্য রত্ন দিয়ে মন্দির তৈরি করতে। সেই মন্দিরে রত্নখচিত সিংহাসন থাকবে, তার ওপর বসবেন শ্রীকৃষ্ণ। হস্তিনানগরীকে উৎসবের সাজে সাজাতে হুকুম দিলেন। চারিদিকে সাজ-সাজ রব পড়ে গেল।

যথাসময়ে শ্রীকৃষ্ণ এলেন হস্তিনায়। হস্তিনা আলোয়, নাচে, গানে ঝলমল করছে। কোথাও হচ্ছে বেদগান, কোথাও যাগযজ্ঞ। হস্তিনাকে ঠিক ইন্দ্রপুরীর মতো দেখাচ্ছিল। দুর্যোধন শ্রীকৃষ্ণকে রত্নখচিত সিংহাসনে বসালেন। পাহাড়-প্রমাণ ধনরত্ন উপঢৌকন দিলেন শ্রীকৃষ্ণকে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কপট দুর্যোধনের এই আড়ম্বরে মোটেই খুশি হলেন না। অশ্রদ্ধার উপহার স্পর্শ করলেন না তিনি।

পরম ধার্মিক বিদুরের গৃহে শ্রীকৃষ্ণ আতিথ্য গ্রহণ করলেন। স্বয়ং নারায়ণ তাঁর গৃহে এসেছেন দেখে দরিদ্র বিদুর শ্রীকৃষ্ণকে বললেন, "তোমাকে দেওয়ার মতো কিছুই নেই, আমাকে তুমি ক্ষমা করো।" তিনি পরম ভক্তিভরে শ্রীকৃষ্ণের স্তবস্তুতি করতে লাগলেন।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন, "ওহে, তোমার স্তব-স্তুতিতে তো আর আমার পেট ভরবে না। আমি এখনও কিছু আহার করিনি, কিছু খাদ্যবস্তু নিয়ে এসো।"

বিদুরের ঘরে খুদ ছাড়া কিছুই ছিল না। পরম যত্নে তাই রান্না করে শ্রীকৃষ্ণকে খেতে দিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভক্তি ও আন্তরিকতা দেখে অত্যন্ত তৃপ্তির সঙ্গে ওই খুদই আহার করলেন। এই কাহিনী থেকেই বিদুরের খুদ প্রবাদবাক্যটি প্রচলিত হয়েছে।

ছবি দেবাশিস দেব

দাদাগিরি

শ্যামলকান্তি দাশ

কোথায় হরিণ থাকে, আর
কোন্‌খানে থাকে বুনো গাধা
যতই বলি না আমি ঠিক
দাদা তবু বলবেই, 'হাঁদা,

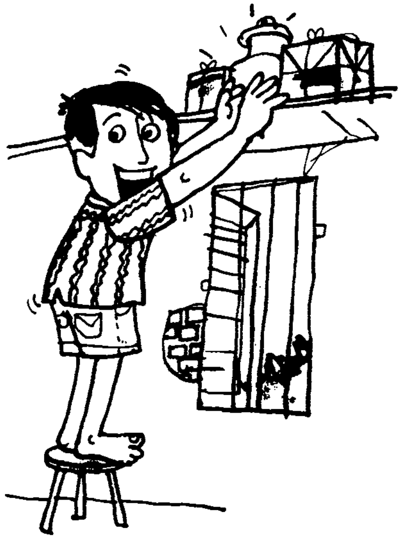
কখন টগর ফোটে, আর
কখন যে ফোটে ঠিক জুঁই
শিখলি না ভাল করে কিছু
কী করে মানুষ হবি তুই ?'

গল্পের মতো করে রোজ
যতই পড়ি না ইতিহাস,
ছোড়দাটা কী যে অদ্ভুত
কিছুতেই করাবে না পাস।

অঙ্ক যতই কষি ভাল
দাদা তবু বলবেই, 'বোকা,
বয়স হয়েছে তোর দশ
এখনও কি তুই কাঁচখোকা ?

কত যে বিষয় আছে, আর
কত কিছু আছে শেখবার—'
এই বলে কান টেনে ধরে
দাদা ঠিক লাগাবেই মার।





রেলের গাড়ি

মতি মুখোপাধ্যায়

কু ঝিক্‌ ঝিক্‌ ভর দুপুরে
রেলের গাড়ি,
বাগান থেকে শোবার ঘরে
দিচ্ছে পাড়ি।
মাঝে পড়ে বসার ঘরের
বড় স্টেশন,
সোফা কোচের আরাম পেতে
উপবেশন।
আবার চলে কু ঝিক্‌ ঝিক্‌
রান্নাঘরে,
শোনপাপড়ি লুকিয়ে আছে
তাকের পরে;
ইঞ্জিনটা এই সময়েই
কয়লা চায়.
ঢক্‌ ঢক্‌ ঢক্‌ কুঁজোর থেকে
জল গড়ায়।
কেবিনম্যানের জিজ্ঞেসাবাদ ঃ
কে রে কে রে ?
যেই না শোনা অমনি গাড়ি
পেছন ফেরে।

ছবি দেবাশিস দেব

■	১	২	■	৩		■
৪	■	৫			■	৬
৭	৮	■	■	■	৯	
১০			■	১১		
১২		■	■	■	১৩	
	■	১৪		১৫	■	
■	১৬		■	১৭		■

সংকেত : পাশাপাশি : (১) এ'র ছেলের নাম রাহুল। (৩) ময়ূর। (৫) ছোট নৌকো। (৭) পত্র। (৯) অভিনেতা। (১০) গহনা-বিশেষ। (১১) গৌতম মুনির শিষ্য। (১২) কোন্ বাসন জামায় থাকে? (১৩) শরীর। (১৪) গঙ্গার উপনদী। (১৬) যে-শব্দ ব্যাকরণেও পাবে গণিতেও পাবে। (১৭) হিংস্র প্রাণী।

উপর-নীচ : (২) মেয়েদের কানে কোন্ খেলা? (৩) নীলবর্ণ। (৪) জাপানি নামের ফুল। (৬) অতীতের এক গৌরবময় নগর। (৮) বাঁশের প্রজাতি। (৯) বাদশাহি আমলের সামন্ত রাজা। (১৪) জনৈক মুনি। (১৫) সদ্যোজাত।

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

গ	বা	ক্ষ	■	শা	লি	ক
রা	জি	■	নে	প	চু	ন
ন	■	■	পো	■	■	ক
■	অ	ঙ্গু	লি	ত্রা	ণ	■
টো	■	■	য়	■	■	তা
টে	নি	স	ন	■	নী	ড়
ম	শা	ন	■	দ্বা	র	কা

চিলেকোঠার ঘরে গিয়ে দেখি ছোটকা তিনটে প্লাস্টিকের কৌটো নিয়ে বিছানায় বসে কী-সব করছে।

খুব সুন্দর দেখতে কৌটো-গুলো। অনেকটা নস্যির ডিবের মতো। একই রঙের তিনটে কৌটো। রঙটায় দারুণ জেল্লা। রং দেখেই বোঝা যায়, কৌটোগুলো খুব দামি।

আমি ঘরে ঢুকেছি, ছোটকা দেখেছে। কিন্তু মুখে কিছু বলল না। একগাদা খুচরো পয়সা নিয়ে কৌটোগুলোয় ঢোকাচ্ছে, মুখ বন্ধ করছে, আবার বার করছে।

বুঝলাম, নিশ্চিত কোনো গূঢ় সমস্যা নিয়ে পড়েছে ছোটকা। কিছু না বলে চেয়ারে গিয়ে বসে রইলাম।

বেশ কিছুক্ষণ বাদে ছোটকার হিসেব শেষ হল। তিন টুকরো



কাগজ নিয়ে তার ওপর কী-সব লিখল। তারপর আমার দিকে ফিরে বলল, "অনেকক্ষণ বসে আছ সত্যবাবু। এমন জব্বর একটা ধাঁধা দেব এবার যে, আরও অনেকক্ষণ বসে মাথা ঘামাতে হবে। লিখে নাও চটপট।"

আমি চটপট লিখে ফেললাম।

প্রথম ধাঁধা ॥ তিনটে কৌটো। একটার মধ্যে রয়েছে দুটো সিকি, একটার মধ্যে দুটো আধুলি। আর-একটা কৌটোয় রয়েছে একটি সিকি ও একটি আধুলি।

তিন টুকরো কাগজে কৌটো-গুলোর পরিচয় লেখা হয়েছে এই-ভাবে—সিকি, আধুলি, সিকি ও আধুলি।

কাগজগুলো কৌটোর ওপর রাখা। কৌটোর মুখ বন্ধ। বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই, কোন কৌটোয় কী রয়েছে।

কাগজগুলো আবার ভুলভাবে রাখা কৌটোগুলোর ওপরে। তিনটে কৌটোতেই ভুল কাগজ রাখা। অর্থাৎ কাগজে যে-পরিচয় লেখা, কৌটোতে সে-রকম পয়সা নেই।

এই অবস্থায় তোমাকে বলা হল, যে-কোনো একটা কৌটো থেকে একটা মাত্র পয়সা বার করে দেখতে পারো তুমি, তারপর সে-পয়সাটা আবার কৌটোর মধ্যে ঢুকিয়ে কাগজগুলোকে এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে কৌটোগুলোর সঠিক পরিচয় পাওয়া যায়।

মনে রাখবে, একটা মাত্র কৌটো থেকে একটামাত্র পয়সা বার করে দেখার সময় অন্য পয়সাটা যে দেখে নেবে, তা চলবে না। আসলে পয়সা হাতেকলমে বার না করলেও চলবে, বুদ্ধি দিয়ে ব্যাপারটার সমাধান করতে হবে। কোন্ কৌটোটা থেকে একটামাত্র পয়সা বার করবে আর তারপর কীভাবেই বা বদলে দেবে কৌটোর কাগজগুলো বা লেবেলগুলোকে?

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ কথায় বলে, স্বর্গ এবং মর্ত্য। স্বর্গ-মর্ত্যের মাঝখানে কী রয়েছে?

তৃতীয় ধাঁধা ॥ সাতজন লোক সাতদিনে সাতটা গর্ত খুঁড়তে পারে। একজন লোক কদিনে আধ-খানা গর্ত খুঁড়বে?

চতুর্থ ধাঁধা ॥ উপযুক্ত সংখ্যা বসাও—

১, ৩, ৬, ১০, ১৫, ২১, ?

গতবারের উত্তর ॥ (১) একজন সিকি দিয়েছিল, অন্যজন খুচরো পঁচিশ পয়সা। সিকি যে দিয়েছে তার ক্ষেত্রেই প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। কুড়ি পয়সার না পঁচিশ পয়সার টিকিট লাগবে। তাই তাকেই প্রশ্ন করেছে কনডাকটর। (২) বৃদ্ধের বয়স ৫১, নাতির ৩। গুণ করলে ১৫৩ হয়, দুজনের বয়সের অঙ্ক কটিই ঘুরে-ফিরে রয়েছে গুণফলে। (৩) ৪ (ওপরে নীচের সংখ্যাদুটোর যোগফলে তৃতীয় সংখ্যা তৈরি হচ্ছে)। (৪) ৯৫ (বন্ধনীর দু-পাশের সংখ্যার যোগফলের অর্ধেক বন্ধনীর মধ্যের সংখ্যা)।

সত্যসন্ধ

কিসের ফোটো



সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যায় ছিল হাতের তালুর ছবি। ফোটো তপন দাস

উত্তর বটে

প্রঃ কোন্ ঋতু আপনার সবচাইতে পছন্দ?
উঃ সব ঋতুই আমার পছন্দ। শীতকালে গ্রীষ্ম পছন্দ, আর গ্রীষ্মকালে শীত।

প্রঃ যমরাজের ওজন কত?
উঃ শ' মন।

প্রঃ পুলিস-কুকুর দেখলে কী করে চেনা যাবে?
উঃ দেখেই চিনে ফেললে পুলিস-কুকুর চোর ধরবে কেমন করে!

প্রঃ কোন্ ভদ্রলোক কেবল জিনিসপত্র হারিয়ে ফেলেন?
উঃ হারানবাবু।

প্রঃ এক বছর আগে তোমাকে উট বলেছিল তো এতদিন পরে নালিশ করছ কেন?
উঃ আজই যে জীবনে প্রথম উট দেখলাম।

প্রঃ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কোন্ মারাত্মক অস্ত্র দেখতে খুব সুন্দর ছিল?
উঃ সুদর্শন চক্র।

সুসেন

মজার খেলা

অল্পবয়সিদের জন্য এই খেলাটা খুব কৌতুকময় এবং খুবই সহজ।

গোল হয়ে দাঁড়াবে সব খেলোয়াড়রা। যতজন ইচ্ছে, ততজনই যোগ দিতে পারে খেলাটায়, কোনো ধরা-বাঁধা সংখ্যা নেই।

এবার এক-একজন খেলোয়াড় একে-একে তার শরীরের কোনো একটা অংশ দেখিয়ে ইচ্ছে করে ভুল নাম বলবে। ভুল বললেই খেলাটার মজা, ঠিক বললেই আউট।

যেমন ধরো, প্রথম খেলোয়াড় তার নাকটা দেখিয়ে দ্বিতীয়জনকে বলল, এই আমার পা।

দ্বিতীয়জন তৃতীয়জনকে তার কান দেখিয়ে বলল, এটা আমার ঠোঁট।

তৃতীয়জন তার চুল দেখিয়ে চতুর্থ খেলোয়াড়কে, এই আমার হাত।

এইভাবে গোল-হয়ে-দাঁড়ানো খেলোয়াড়রা পর-পর ভুল বলে যাবে। এক রাউন্ড শেষ হলে, কেউ যদি আউট হল তো ভাল, না হলেও আবার চলবে নতুন করে।

মজার ব্যাপার কী জানো, ভুল বলাটা শুনতে যত সহজ, আসলে তত সহজ ব্যাপার নয়। হঠাৎ দেখবে,



অন্যমনস্কভাবে একজন-না-একজন ঠিক ভুল করে ফেলছে। আর তক্ষুনি সে আউট।

খেলেই দেখো খেলাটা। কী মজা আর কী হইচই না হবে।

একজন শরীরের যে-অংশ দেখিয়ে ভুল নাম বলল, অন্যজন সে-অংশ দেখাতে পারবে না—এমন কিন্তু নয়। তবে ভুল নাম বলতে হবে প্রত্যেককেই।

মজারু

হাসিখুশি



হরেন নরেন আর বরেন একটা ঘোড়ার গল্প বলছিল। হরেন বলল "আমার মামার একটা ঘোড়া ছিল। একদিন মাঠে দৌড়তে দৌড়তে মামা ঘোড়া থেকে পড়ে পা মচকে গেলে ঘোড়াটা মামার জামা ধরে তার পিঠের উপর তুলে বাড়ি নিয়ে খাটে শুইয়ে দিয়েছিল। কেবল তাই নয়, সে গিয়ে আবার একটা ডাক্তারও ডেকে এনেছিল।"

বরেন বলল, "খুব বুদ্ধি ছিল তো ঘোড়ার?"

হরেন বলল, "না খুব বুদ্ধি ছিল ঘোড়াটার বলতে পারব না—ও নিয়ে এসেছিল একটা ঘোড়ার ডাক্তার।"



এক ভদ্রলোক লেকের ধারে বিরাট একটা কুকুর নিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। তিনি বেড়াতে বেড়াতে তাঁর পকেট থেকে একটা বল বের করে জলে ছুঁড়ে দিলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে কুকুরটা জলের উপর দিয়ে দৌড়ে গিয়ে বলটাকে মুখে করে আবার একইভাবে ফিরে এল। ভদ্রলোক এ-রকম কয়েকবার করার পর অন্য একজন ভদ্রলোক এসে তাঁকে বললেন, "কুকুরটাকে কি আপনি কিনেছেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"কত দাম নিয়েছে?"

"দু হাজার টাকা।"

"দু হা-জা-র? আপনাকে ঠকিয়েছে মশাই, ডাহা ঠকিয়েছে। কুকুরটা সাঁতার পর্যন্ত জানে না।"

ছবি দেবাশিস দেব


নিজে আসুন
এবং সবাইকে
সঙ্গে আনুন
ন্যু ইয়র্কের
সুসজ্জিত
ছোট্ট পৃথিবীতে
(ছোটদের জন্যে বিশেষ বিভাগ)
শিশু থেকে আরম্ভ করে
কিশোর পর্যন্ত
(বালক বা বালিকা উভয়ের জন্যেই)
নিউ ইয়র্কের আকর্ষণীয় শিশু বিভাগে
রঙ বেরঙের পোষাকের আধুনিকতম
নতুন নতুন ডিজাইন--
তার মধ্যে থেকে বেছে নিন নিজের
পছন্দ মতো।
পোষাকের এই অপূর্ব সমাহার দেখুন
• শার্ট • বুশ শার্ট • নাইটি • বাবা স্যুট
• বেলবটম স্যুট • ফ্রক / ম্যাক্সি / মিডি
এ ছাড়াও মনকে প্রলুব্ধ করার মতো
আরও অনেক ঝলমলে জামা কাপড়
ন্যু ইয়র্ক
লিণ্ডসে স্ট্রীট, কলিকাতা
IT'S A PARTY! COME AND JOIN THE FUN
HI!
LET'S GO TO NU YORK'S SMALL SMALL WORLD
NU YORK
RUSH! HURRY! TO NU YORK'S SMALL SMALL WORLD
SMALL SMALL WORLD



খেলতে খেলতে

চুনী গোস্বামী

॥ ৩৫ ॥

চৌষট্টিতে মারডেকা ফুটবল প্রতিযোগিতার সেই মজার ঘটনা দুটির কথা শোনো।

গ্রুপ লীগে থাইল্যাণ্ডের সঙ্গে আমাদের খেলাটি হয়েছিল পেনাংয়ে,— কুয়ালালামপুরে নয়। আকাশ খুব মেঘলা ছিল বলে মাঠে হাজার পাঁচেক দর্শক মাত্র উপস্থিত ছিলেন। তারপর খেলা শুরু হল জোর বৃষ্টির মধ্যে। এত বৃষ্টি যে, ভাল করে কিছু দেখা যাচ্ছিল না। তারই মধ্যে থাইল্যাণ্ড একটি গোল করে বসল। আমাদের গোলকীপার ছিল মুস্তাফা। মুস্তাফা করল কী জানো? খুব চটপট গোলপোস্টের বাইরে দিয়ে গোল থেকে বেরিয়ে গিয়ে নেটের কোল থেকে বলটিকে টেনে এনে গোলকিকের স্পটে বসিয়েই তাড়াতাড়ি গোলকিক করে দিল। থাইল্যাণ্ডের খেলোয়াড়রা হতবাক হয়ে দেখল তাদের ন্যায্য গোলটি জলের মাঠে মারা যাচ্ছে। মুস্তাফা এত তাড়াতাড়ি এবং গোল হয়নি এমন ভাব করে বলটি নিয়ে এসে গোলকিকের স্পটে বসিয়েছিল যে, রেফারীরও সন্দেহ জেগেছিল বল ঠিক গোলের মধ্য দিয়ে গেছে কিনা।

থাইল্যাণ্ডের খেলোয়াড়রা এবার ঘিরে ধরল রেফারীকে। সমস্বরে গোলের দাবি জানাতে আরম্ভ করল। সেখানে এলেন দুই লাইন্সম্যান। আমরাও সেখানে জড়ো হয়ে রেফারী ও দুই লাইনসম্যানকে বোঝাতে চেষ্টা করলুম—গোল হয়নি। বল পোস্টের বাইরে দিয়ে গিয়ে নেটের কোলে জমা হয়েছিল। জোর জলের মধ্যে বুঝতে পারেনি বলেই থাইল্যাণ্ডের খেলোয়াড়রা ভেবেছে গোলের মধ্য দিয়েই বল ঢুকেছে।



রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণনের হাত থেকে অর্জুন পুরস্কার নিচ্ছেন চুনী গোস্বামী

শুরু হল তর্কাতর্কি। তর্কাতর্কি আবার কীভাবে জানো? হাবেভাবে, ইঙ্গিতে এবং যার যে ভাষা সেই ভাষায়। সে এক আন্তর্জাতিক ঝগড়া। কারণ রেফারী ছিলেন বর্মার লোক। একজন লাইন্সম্যান কোরিয়ার, একজন ইন্দোনেশিয়ার। ওঁরা কথা বলছিলেন ওঁদের ভাষায়। থাইল্যাণ্ডের খেলোয়াড়রা তাদের ভাষায় কথা বলছিলেন। আর আমরা ভারতীয়রা ঝগড়া করছিলুম ইংরেজি, বাংলা, হিন্দি, তামিল সব ভাষা মিলিয়ে। সাত-আট রকমের ভাষায় সে এক অদ্ভুত ঝগড়া। কেউ কেউ অবশ্য ইংরেজিতে নিজের বক্তব্য বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু আমরা ইংরেজিতে নো-ইয়েস ছাড়া বেশি কথা বলিনি। ভাবটা দেখিয়েছিলুম যেন আমরা ইংরেজি জানি না। কারণ আমাদের তো পাপী মন। জানতুম গোল হয়েছে তবু দাবি জানাচ্ছি গোল হয়নি। তাই ওঁদের কাছে দুর্বোধ এমন ভাষায় সে-দাবি জানাচ্ছিলুম যাতে বুঝতে না পারেন। ওঁরা কিছুই বুঝতে



মারডেকা ফ্টবলে মালয়েশিয়ার রাজার হাত থেকে রানার্স আপের রৌপ্য পদক নিচ্ছেন চুনী গোস্বামী

পারছিলেন না। বর্মার রেফারী তাকাচ্ছিলেন কোরিয়ার লাইনসম্যানের দিকে। ইন্দোনেশিয়ার লাইনসম্যান বর্মার রেফারীর দিকে। তখনো জোর বৃষ্টি হচ্ছিল। দর্শকরা চেঁচাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত বেনিফিট অব ডাউটে রেফারী ও লাইনসম্যানরা আমাদের দাবি মেনে নিলেন। গোলকিক স্পটে আবার বল বসিয়ে মুস্তাফা কিক করল। খেলা আবার শুরু হল।

আগেই তো লিখেছি, সেদিন থাইল্যান্ডের বিরুদ্ধে আমরা জিতেছিলুম ২—১ গোলে। কিন্তু সে-জয় মুস্তাফার উপস্থিত বুদ্ধির ফলেই। মুস্তাফা খুব ভাল গোলকীপার ছিল। খেলত মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবে। খেলতও যেমন ভাল, তেমন দুষ্টবুদ্ধিও ছিল। ইংরেজিতে একটা কথা আছে—যুদ্ধের ব্যাপারে আনফেয়ার বলে কিছু নেই। ফুটবল খেলাও তো একরকমের যুদ্ধ। তবু কিন্তু খেলার ব্যাপারে এই ধরনের চালাকি স্পোর্টসম্যান স্পিরিটের সঙ্গে একেবারেই বে-মানান। যখন খেলার মধ্যে ডুবে ছিলুম, তখন এই ন্যায়-অন্যায় সবসময় ভালভাবে বুঝে উঠতে পারিনি। আজ মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করছি আমরা অন্যায় করেছিলুম।

হ্যাঁ, গোল-কিক মানে তোমরা কি ধরে নিয়েছ গোল হবার পরের কিক? তা কিন্তু নয়। আক্রমণকারী দলের কোনো খেলোয়াড়ের স্পর্শের পর গোল ব্যাতিরেকে বল রক্ষণকারী দলের দিকের গোললাইন অতিক্রম করে গেলে গোলের সামনে বল বসিয়ে যে কিক করা হয় তাকে গোল-কিক বলে। গোল হবার পর মধ্যমাঠের কেন্দ্রবিন্দুতে বল বসিয়ে যে কিক করা হয় তাকে বলে প্লেস-কিক। প্লেস-কিকের অপর নাম কিক-অফ। খেলা শুরুর কিককেই বলা হয় কিক-অফ।

আর একটি কথা জেনে রেখো। ভাষার গোলমালের জন্যই হলুদ ও লাল কার্ডের প্রবর্তন হয়েছে। আন্তর্জাতিক খেলায় এক দেশের খেলোয়াড় অন্য দেশের রেফারীর ভাষা নাও বুঝতে পারেন। খেলোয়াড়দের ভাষা না-বুঝতে পারেন রেফারীরা। রেফারী হয়তো মুখে ওয়ার্নিং দিলেন। খেলোয়াড় সেটা বুঝতে পারল না। খেলোয়াড় হয়তো রেফারীকে কিছু বলল, রেফারী ভাবলেন

খেলোয়াড় তাঁর সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানাচ্ছে। হয়তো মার্চিং অর্ডার দিলেন।

এই ভাষা বোঝার ভুলে আমাদের দেশেই পৃথিবীর এক নামী খেলোয়াড়কে মার্চিং অর্ডার দেওয়া হয়েছিল। কোন নামী খেলোয়াড় জানো? সোভিয়েত রাশিয়ার ইগর নেট্টো। দেশে বিদেশে প্রচুর নামী ফুট-বলারের সঙ্গে খেলেছি। তাঁদের খেলা দেখেছি। কিন্তু নেট্টোর মতো শিল্পী ফুট-বলার দেখেছি খুবই কম। পায়ের নিপুণ টানে ফুটবলকে দিয়ে যেন কথা বলাতেন। সেই নেট্টোই ভাষার শিকার হলেন।

ঘটনাটা পঞ্চান্ন সালের। বোম্বাইয়ের কুপারেজ মাঠে। বেসরকারী টেস্ট খেলায় একটি ফাউলের পর ভারতের দু-তিনজন খেলোয়াড়ের সঙ্গে রাশিয়ার দু-তিনজন খেলোয়াড়ের এক জটলা ও গোলমালের সৃষ্টি হয়েছিল। অধিনায়ক হিসাবে নেট্টো রেফারীর কাছে এসেছিলেন তাঁর খেলোয়াড়দের হয়ে ক্ষমা চাইতে। গোলমালের ফলে তিনি একটু উত্তেজিত ছিলেন। রেফারীর কাছে ক্ষমা চাইবার সময় সেই উত্তেজনা প্রকাশ হয়ে পড়ে। রেফারী রুশ ভাষা বুঝতে না পেরে ধরে নেন নেট্টো তাঁকে গালাগালি করছেন। তখনই তিনি নেট্টোকে মাঠ থেকে বের করে দেন। রাশিয়ানরা তাতে ভীষণভাবে ক্ষুব্ধ হয়। কারণ শুধু মস্ত মাপের ফুটবলারই নন, নেট্টো ছিলেন অসাধারণ ভদ্র খেলোয়াড়। আচার-আচরণে কোনোদিন তাঁর চরিত্রে নাকি কালির দাগ পড়েনি। সেই জন্যই মাস্টার অব স্পোর্টস খেতাব পেয়েছিলেন। রুশ দলের ম্যানেজার পরে সাংবাদিকদের কাছে ঘটনাটি ব্যাখ্যা করে বলেন। রসিকতা করে বলেছিলেন, ''আমরা ভারতীয় ভাষা শিখে ভারতে এলে এই গোলমাল হত না।''

ইংল্যান্ডে ছেষট্টির বিশ্বকাপ ফুটবলে একইভাবে মার্চিং অর্ডার দেওয়া হয়েছিল আর্জেন্টিনার অধিনায়ক রেটিনকে। রেটিনও তাঁর খেলোয়াড়ের হয়ে রেফারীর কাছে অপরাধ স্বীকার করতে গিয়েছিলেন। রেফারী ভাষা বুঝতে পারেননি। আর্জেন্টিনা খেলছিল ইংল্যান্ডের সঙ্গে। ওই ঘটনার পর ভাষা-সমস্যার সমাধানের জন্য হলুদ ও লাল কার্ডের ব্যবহার চালু হয়ে গেছে।

অবশ্য কার্ড দেখানোর অন্য সুফলও



মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী টুংকু আবদুল রহমানের সঙ্গে ভারতীয় ফুটবল দল

আছে। রেফারী যদি "ওয়ার্নিং" বা "কশান" কথাটি মুখে বলে খেলোয়াড়কে সতর্ক করে দেন, সেটা দর্শকরা নাও বুঝতে পারে। কিন্তু হলুদ কার্ড বের করে যদি খেলোয়াড়কে দেখিয়ে সতর্ক করে দেন তবে মাঠের সবাই বুঝতে পারে এবং খেলোয়াড়ও লজ্জায় পড়ে। আবার অপরাধ না করার জন্য সতর্ক থাকে। সে-কথা থাক। মারডেকা ফুটবলের দ্বিতীয় মজার ঘটনাটির কথা শোনো।

বিপক্ষ দলের শক্তি ও খেলার ছক অনুযায়ী অনেক সময় খেলার ট্যাকটিস বদল করতে হয়। কিন্তু ম্যান-টু-ম্যান গার্ড করে খেলা সব দলেরই সাধারণ রীতি। তার মধ্যেই ঠিক করে নেওয়া হয় কোন্ খেলোয়াড়ের উপর কে নজর রাখবে। বিশেষ করে যে খুব ট্যালেন্টেড খেলোয়াড় বা খুব ভাল স্ট্রাইকার, তার দিকে লক্ষ রাখার জন্য নির্দেশ থাকে বিশেষ কারো উপর। আমাদের দু-তিনটি খেলা দেখেই দক্ষিণ কোরিয়ার খেলোয়াড়রা আমাদের প্রায় চিনে নিয়েছিল এবং ট্যাকটিকসও ঠিক করে নিয়েছিল। কারণ আমাদের এক-একজনের এক-এক রকম চেহারা। গায়ের রং আলাদা। কিন্তু আমরা ওদের চিনব কীভাবে? সবারই একরকম গায়ের রং। প্রায় একরকম হাইট। মুখের আদলও প্রায় এক। আমরা জানতুম ওদের রাইট-ইন দারুণ খেলোয়াড়। অন্য দু-তিনজনের খেলাও আমাদের চোখে লেগেছিল। কিন্তু জানতুম না তারা সেমিফাইনালে এক পজিশনে খেলবে কিনা।


পি সিংহ   মুস্তাফা

দুই হাফব্যাক পি সিংহ ও ফ্রাঙ্কো কার কার প্রতি বিশেষ নজর রাখবে, এই বিষয়ে যখন আমরা আলোচনা করে কিছু ঠিক করতে পারছি না তখন পি সিংহই উপায় বাতলে দিল। প্রশান্ত সিংহকে আমরা সবাই বলতুম সিংহ মশাই। সে বলল, "দ্যাখো চুনীদা, কোরিয়ার রাইট ইন আর লেফট ইনের দিকে যদি খুব ভাল করে নজর করো, তবে দেখবে ওদের একজন একটু কঙ্কাল-টাইপের। আর অন্যজন ভুতো বোম্বাই আমের মতো। রাইট-ইন হচ্ছে কঙ্কাল টাইপের। ভুতো বোম্বাইয়ের মতো হচ্ছে লেফট-ইন।"

আমি চটপট বললুম, "বেশ, কঙ্কাল রইল সিংহ মশাইয়ের জন্য। ফ্রাঙ্কোর জন্য ভুতো বোম্বাই।" পি সিংহ চেঁচিয়ে বলে উঠল, "সিংহ মশাই কি শুধু কঙ্কাল নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারে?"

সত্যিই পি সিংহ সেদিন সিংহবিক্রমে খেলেছিল। কোরীয় দলের বেশিরভাগ আক্রমণ হয়েছিল তার ক্ষুধার খাদ্য। আর আগেই তো লিখেছি, সে-বছর টুংকু আবদুল রহমান ট্রফিটি নিয়ে আমরা ফিরতে পারতুম, যদি বর্মার সঙ্গে ফাইনালে পি সিংহের দুর্দান্ত শটটি পোস্টে লেগে ফিরে না আসত। (ক্রমশ)

লেখক হিসাবে খ্যাতি হবার পর তাঁর কলেজে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে অভিনন্দন জানানো হয়। অভিনন্দনের উত্তরে বিভূতিভূষণ কলেজে কেমন করে ক্লাস ফাঁকি দিতেন সেইসব কাহিনী বলসেন। সভার শেষে কবি কালিদাস রায় বললেন, "তোমার সাহিত্যিক-প্রতিভায় কলেজের দান কতখানি, এসব বলবে তো!" বিভূতিভূষণ বললেন, "সে তো অসত্য ভাষণ হত। এই কলেজ থেকে পাস করে একটা মাস্টারি পেয়েছি, তার জন্যে ধন্যবাদ তো দিয়েছি। যার জন্যে এঁরা অভিনন্দন জানালেন তার সঙ্গে কলেজের কী সম্পর্ক বলুন। কলেজের কোনো ছাত্র পি এইচ ডি কি আই সি এস হলে যা বলতেন, আমি তা কী করে বলি?"

জবর খাইয়ে

হিমানীশ গোস্বামী

"আমি কাঁচা মুরগি খেতে পারি," লোকটি জানাল। "এক সঙ্গে, মানে পরপর ছটা। এক-একটার ওজন তিনশো থেকে চারশো গ্রাম।" লোকটি থামল। তারপর বলল, "আপনার সার্কাসে এই খেলা দেখালে খুব জমবে।" লোকটি আরও বলল, "মুরগি খাওয়ার পর পরপর দশ বোতল দুধও সাবড়ে দিতে পারি।" তারপর একটু থেমে বলল, "সব শেষে দু কেজি রসগোল্লা—হ্যাঁ, তাও আমি শেষ করতে পারি। আমি এই সার্কাসে একটা চাকরি চাই।"

ম্যানেজার দুবে বললেন, "চমৎকার! তবে কী জানো—আমার তো বৃহস্পতিবার দুটো



শো। একটা পাঁচটার সময়, অন্যটা আটটার সময়। তুমি কি দুবার ঐ আশ্চর্য ঘটনা ঘটাতে পারবে?"

"পারব সার!" বলল লোকটি।

"ভেবে দেখ," দুবে বললেন, "ঐ রকম রাক্ষসের মতো একবার খাওয়ার পর আবার খাওয়া, তিন ঘণ্টার মধ্যে, সে কি তোমার পক্ষে সম্ভব হবে?"

"হবে, সম্ভব হবে।" লোকটি বলল।

দুবে বললেন, "আরও একটা কথা আছে। শনিবার দিন আমাদের শো হয় দিনে চারবার। বারোটা, তিনটে, ছটা এবং নটায়। এখন আমার প্রশ্ন..."

লোকটি বলল, "প্রশ্ন আপনার সঙ্গত। তবে কিছু ভাববেন না, আমি পারব। কোনো অসুবিধে হবে না।"

দুবে বললেন, "বললে তো আর হবে না—এ তো অমানুষিক ব্যাপার। এরকম করা সহ্য হবে তো তোমার?"

লোকটি বলল, "সে-ভাবনা তো আপনার নয়, সে-ভাবনা আমার।" লোকটি টান-টান হল। বলল, "সার তাহলে চাকরির শর্ত, মানে আমাকে কত দেবেন প্রতি দিন?"

দুবে বললেন, "টাকা তুমি ভালই পাবে হে, ভালই পাবে। ঠিকমতো করতে পারলে তুমি প্রতি শো-য়ে পঞ্চাশ করে পাবে।"

"ঠিকমতো করতে পারব সার। একবার পরীক্ষা করেই দেখুন না।"

দুবে বললেন, "আহা, আর-একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। রবিবার দিন আমাদের পাঁচটা করে শো। বারোটা তিনটে, ছটা, নটা এবং আবার রাত বারোটায় একটা। পাঁচটা শোয়ে ঐ রকম খেল দেখাতে পারবে তো?"

লোকটির মুখ গোমড়া হল। সে বলল, "মাপ করবেন, ওটি পারব না।"

লোকটি চলে যেতে উদ্যত হল।

দুবে তাকে ডাকলেন। বললেন, "একজনের পক্ষে অতটা খাওয়া সম্ভব নয়—কী বলো?"

লোকটি করুণ চোখে দুবের দিকে তাকাল। বলল, "ঠিক তা নয়—প্রত্যেক রাত্রে আমি আমার স্ত্রী এবং ছেলেপুলেদের সঙ্গে খানা খাই। রাত বারোটায় শো আরম্ভ হলে বাড়িতে গিয়ে খানা খাব কখন? না, এমন চাকরি আমার পোষাবে না।"

ছবি দেবাশিস দেব



ছবি এঁকেছে **সৌরভ মুখোপাধ্যায়** (বয়স ১০)



মার্কেট

ভেকেট টেকেট, প্যাকেট,
মার্কেটেতে যাওয়ার জন্যে,
পরল নতুন জ্যাকেট।
মার্কেট গিয়ে ওরা,
খেতে বসল ওমলেট।
যেই ওমলেট এল,
তিন ভাই তা খেল।
চাইল যখন টাকা,
দেখে পকেট ফাঁকা।

সুরজিৎ গুপ্ত (বয়স ৮)



ছুটিতে

যাবে বলে; কতদূর
গিরিডি না মধুপুর ?
যশিডিও যেতে পারো,
যদি যেতে চাও আরো।
যেতে পারো দেওঘরে,
গিরিডিটা হবে পরে।
দেওঘরে প্যাঁড়া পাবে
যতো খুশি তত খাবে।

টিঙ্কু চৌধুরী; (বয়স ১৪)

পাখি হলাম



এই নিস্তব্ধ দুপুরে সমস্ত বাগানটায় ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ। আমগাছটার নীচে বসে আমার মনটাও যেন দুঃখের তাপে ঝাঁ ঝাঁ করছিল। হায় ভগবান অঙ্ক পরীক্ষাটা যে এত খারাপ হবে ভাবতেই পারিনি। যে করেই হোক আমায় পাশ করিয়ে দাও। উফ্ আমার আর মানুষ হয়ে বেঁচে থাকতে ইচ্ছা করে না।

হঠাৎ একটা নীল পাখির শিসে চমক ভাঙল। আমি যদি পাখি হতাম, তাহলে লেখাপড়া করতে হত না। সারাদিন উড়ে বেড়াতাম। হঠাৎ পাখিটা ঠিক আমার মাথার ওপরের ডালটায় বসে বলল, "আমি তোমার মনের কথা বুঝতে পেরেছি। তুমি কি পাখি হতে চাও? যদি হও তাহলে তোমাকে মা, বাবা বোন সকলের মায়া কাটাতে হবে। পারবে তা?"

"এ আর এমন কী কথা? সারা জীবন অঙ্ক কষার থেকে পাখি হওয়া অনেক ভাল। প্রথম প্রথম একটু কষ্ট হবে বটে, কিন্তু পরে সব ঠিক হয়ে যাবে। হ্যাঁ, আমি পাখি হব।"

হঠাৎ দেখি, পাখিটা আমার চারদিকে উড়ে উড়ে কীসব যেন বলতে লাগল, আর আমার দেহটা ক্রমশ হালকা হতে লাগল। আরে! আমি যে উড়তে পারছি, কী মজা! আমাকে আর মানুষ হয়ে থাকতে হবে না। নীল পাখি! তুমি কী ভাল, আজ থেকে আমি তোমার বন্ধু।

ডায়মন্ড চট্টোপাধ্যায় (বয়স ১৩)



ছবি এঁকেছে **মলয় হাজরা** (বয়স ১২)



কালো চমরি

অরুণাচলের উপকথা)

আরতি দাস

অরুণাচল প্রদেশের বম্‌-ডি-লা পাহাড়ের নিচুতলায় শেরদুক্‌পেনরা বাস করে। ওদের ধারণা, তিব্বতের এক রাজার বংশ থেকে ওরা এসেছে। তাই শেরদুক্‌পেন উপকথায়, নাচে তিব্বতের চমরিগাইয়ের গল্প আছে।

কীভাবে, প্রথম চমরি গাইটি, পৃথিবীর মানুষের হাতে ধরা পড়ল, এ বিষয়ে উপকথাটি ভারী সুন্দর।

আপাপেক্‌ আর জানুমু, দুই বুড়োবুড়ি পাহাড়ে ঘর বেঁধে থাকত। অনেক খেত-জমি সম্পত্তি আপাপেকের। তিন ছেলে ওদের। বড় গাপ্‌পা-গামব্রু, মেজ তেপাগালু আর ছোট ছেলের নাম দাগিয়ে-সামব্রু।

বুড়ো হয়েছে আপাপেক্‌। তাই একদিন সব খেত-জমি সমান দুই ভাগে ভাগ করে, বড় আর ছোট ছেলেকে দিয়ে দিল। মেজ তেপাগালু কিছুই পেল না। তখন তেপাগালু মা-বাবার কাছে গিয়ে নিজের ভাগ চাইল। কিন্তু ওর বাবা-মা ওকে কিছুই দিতে রাজি হলেন না।

তখন তেপাগালুর মনে খুব দুঃখ হল। ভাবল খেত-জমি কিছুই যখন নেই আমার তখন খাওয়া জুটবে কোত্থেকে? তাহলে মিছিমিছি বাড়িতে বসে থেকেই বা কী লাভ? বরং অন্য কোথাও গিয়ে রুটি রোজগারের চেষ্টা করা ভাল।

এ কথা ভেবে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল ও। যেতে যেতে জন্তু-জানোয়ারের দেবতা চুংবা-সংগিয়াতের সঙ্গে দেখা। ও তাড়াতাড়ি জন্তুর দেবতাকে নমস্কার করে শুধোল, "আমি কি কোনদিনই আমার বাবার সম্পত্তির ভাগ পাব না?" চুংবা-সাংগিয়াত বললেন, "না, তুমি কিছুই পাবে না।"

তখন অপদেবতাদের কাছে গেল তেপাগালু। তারাও বলল বাবার খেত-জমির ভাগ পাবে না ও। সবশেষে বাতাসকে জিজ্ঞাসা করতে বাতাসও যখন সেই একই জবাব দিল, তখন ও মনের দুঃখে গভীর জঙ্গলে চলে গেল।

বিশাল সব গাছের জটলার মধ্যে, কোনও মতে পথ করে হাঁটতে হাঁটতে একদিন এক পাহাড়ের গায়ে মস্ত বড় একটা গুহার মতো দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল তেপাগালু। সে

গুহা যেমন বড়, তেমনই অদ্ভুত ধরনের।

বেশ চওড়া গুহাটির দুপাশের নিচু গভীর নালা দিয়ে খলখল শব্দে জল বয়ে আসছে। অথচ মাঝখানের পথটা এমন উঁচু আর শুকনো যে, দিব্যি হেঁটে যাওয়া যায়। তেপাগালুর মনে কোনও ভয়-ডর নেই। ও সোজাই ভেতরে ঢুকে গেল।

একেবারে ঘুটঘুটে অন্ধকার। গুহার মধ্যে কী আছে না আছে, কিছু বোঝার উপায় নেই। নাক বরাবর হাঁটতে হাঁটতে এক সময় মালুম হল, পথটা ঢালু হয়ে ক্রমশ নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে। সেই নাবাল সুড়ঙ্গপথে অনেক নিচুতে নেমে দেখতে পেল, বিশাল এক পাখি, তিনটে বড়-বড় ডিমের ওপর বসে তা দিচ্ছে।

খিদেয় তখন পেট জ্বলছে তেপাগালুর। সেই যে বাড়ি ছেড়ে এসেছে, তারপর আর কিছুই জোটেনি। পাখিটাকে দেখেই হাসিমুখে বলল, "তোমাকে পেয়ে ভালই হল। আচ্ছা, এখানে তোমরা কী খেয়ে বেঁচে আছ, বলতে পারো?"

পাখি চাল খায় শুনে, নিজের জন্য কিছু চাল চাইল তেপাগালু। পাখি বলল, "চাল তো আমি জমিয়ে রাখি না। গুহার বাইরে গিয়ে জোগাড় করে আনি। তোমার জন্যও চাল আনতে পারি। কিন্তু ডিমগুলোকে যদি ফেলে রেখে যাই, ঠান্ডায় নষ্ট হয়ে যাবে।"

"না-না, তোমার কোনও ভয় নেই," বলল তেপাগালু "তুমি যতক্ষণ না ফিরে আসছ, ততক্ষণ আমি হাত আড়াল করে ঢেকে রাখব ডিমগুলো। আমার হাতের গরমে দিব্যি ওম হবে।" একথা শুনে তেপাগালুর ভরসায় ডিম রেখে পাখি উঠল। যাবার সময় বারবার করে বলল, "তুমি যেন কক্ষনো ডিমগুলো উলটে দিও না। তাহলে কিন্তু বিষম বিপদ হবে।"

তেপাগালু কথা দিল, ডিম ছোঁবে না ও। শুধু দুহাতের আড়ালে ডিমগুলো গরম রাখবে। তখন নিশ্চিন্ত হয়ে চলে গেল পাখিটা।

কথা দিলে কী হবে? কোনও কোনও মানুষের কৌতূহল খুব বেশি। হাত দিয়ে ঘিরে রাখতে রাখতে ওর মনে হল, দেখাই যাক না, ডিম উলটে দিলে কী হয়? এই না ভেবে, তিনটে ডিমই উলটে দিল তেপাগালু।

একটু পরেই চাল নিয়ে ফিরল সেই বিশাল পাখি। এসেই দেখে, ডিম উলটে দিয়েছে তেপাগালু। তখন বিষম রেগে, একটি কথাও না বলে, গুহার বাইরে উড়ে চলে গেল পাখিটা। অন্ধকার গুহার মধ্যে একা পড়ে রইল তেপাগালু।

জনপ্রাণী কেউ কোথাও নেই। শুধু দুপাশের গভীর নালা বেয়ে কল-কল খল-খল শব্দে জল বয়ে যাচ্ছে। তখন ভীষণ ভয় পেয়ে কাঁদতে লাগল তেপাগালু।

অনেক কান্নাকাটির পর একসময় ওর মনে হল, দেবতারা কখনোই নিষ্ঠুর নন। মানুষের ওপরে অনেক দয়ামায়া ওঁদের। তাই একটা ডিম হাতে নিয়ে, জন্তুর দেবতা, চুংবা-সাংগিয়াতকে ডেকে বলতে লাগল, "আমার এই দুঃখ আর বিপদে তুমিই একমাত্র ভরসা। তোমার দয়ায় এই ডিম থেকে এমন কোন প্রাণীর জন্ম হোক, যে আমার সহায় হবে।" এই বলে লাঠির এক ঘা মারতেই, ডিমটা ভেঙে ধবধবে সাদা এক চমরি গাইয়ের বাচ্চা বেরিয়ে এল। কিন্তু তেপাগালুর এমনই বরাত যে, বাচ্চাটা তৎক্ষণাৎ উড়ে চলে গেল, পশুর দেবতা চুংবা-সাংগিয়াতের কাছে।

দ্বিতীয় ডিমটা ভাঙতে একটা লাল চমরি গাইয়ের বাচ্চা বেরিয়ে পড়েই, জঙ্গলের অপদেবতাদের কাছে ছুটে চলে গেল। আর মাত্র একটা ডিম আছে। খুব ভয় পেয়ে ও তখন বারবার বলতে লাগল, "দোহাই চুংবা-সাংগিয়াত দেখো, যেন এই শেষ ডিমটা আমার কাজে লাগে।" এই বলে লাঠির ঘা মারতেই, ডিম

বদ্যি বলেন

শচীন্দ্র ভৌমিক

ফর্সা রোগা গড়নটি তার
ফর্সা রোগা গড়ন ;
একটু নড়ন চড়ন হলেই
একটু নড়ন চড়ন।
বদ্যি দেখে বলেন তারে
আট-শুন্যোয় মরণ !!

ভেঙে বেরোল কুচ্‌কুচে কালো রঙের এক বাচ্চা চমরি। বেরিয়ে পড়েই বাচ্চাটা ঝুপ করে ডুবে গেল গুহার কিনারায় বয়ে যাওয়া গভীর নালার মধ্যে। সেই ভয়ানক অন্ধকারে অনেক চেষ্টা করেও বাচ্চাটাকে দেখতে পেল না তেপাগালু।

তখন আর কী করে! মনে মনে খুব কষ্ট পেয়েও আশা ছাড়ল না। কোনও মতে অন্ধকার হাতড়ে, সাবধানে পা ফেলে ফেলে, একসময় গুহার বাইরে চলে এল। বাইরে আসতেই খোলা হাওয়ার ঝাপটা লাগল গায়ে. মুখে। মাথার ওপরে এক টুকরো আকাশ, জঙ্গলের গাছপালা, ফুল, পাখি দেখতে পেয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ল। তারপর লতাপাতা দিয়ে একটা শক্ত দড়ি বানিয়ে গুহার মুখে বসে রইল।

এক এক করে দিন যায়। রোজই ও ভাবে আজ হয়তো চমরির বাচ্চাটা জল থেকে বেরোবে। এমনি করে আশায় আশায় এক বছর কেটে গেল। যেদিন এক বছর পুরো হল, সেদিন দেখে কী, গুহার ঠিক সামনেই জলের ভেতর থেকে মাথা তুলেছে কালো চমরির বাচ্চাটা। আর যাবে কোথায়? চট করে দড়ির ফাঁসটা গলিয়ে দিল বাচ্চাটার গলায়। তারপর হিড়-হিড় করে টেনে আনল জলের বাইরে।

এবারে সোজা নিজের গাঁয়ের দিকে হাঁটতে লাগল তেপাগালু। বনের ধারে ডাল-পালা খড়কুটো দিয়ে ঘর বেঁধে খুব যত্নে আদরে রেখে দিল বাচ্চাটাকে। আরও এক বছর পরে কালো চমরির বাচ্চা হল। তখন চমরির দুধ, দুধ থেকে ঘি-মাখন তৈরি করে বেচে অনেক টাকাকড়ি হল তেপাগালুর। আর কোনও অভাব, দুঃখ রইল না ওর।

ছেলে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে, অনেক টাকা রোজগার করে বড়লোক হয়েছে শুনে, আপাপেক আর জানমু বাকি দুই ছেলেকে নিয়ে তেপাগালুর বাড়িতে চলে এলেন। ওদের পেয়ে তেপাগালুও খুব খুশি। যে চমরি থেকে ওর এত বাড়বাড়ন্ত, তার সম্মানে ওরা সবাই নেচে গেয়ে খুব আনন্দ করল।

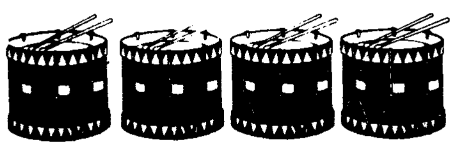
আজও শেরদুকপেনরা সেই প্রথম চমরির কথা মনে রেখে নকল চমরি গাই বানিয়ে চমরি নৃত্যের আয়োজন করে। অরুণাচলের রূপা কি শেরগাঁও গেলে, যে কেউ এ নাচ দেখতে পাবে।

ছবি মাখন দত্তগুপ্ত

ছবির মজা



কী সুন্দর পুতুল! কিন্তু রঙিন নয়। এক কাজ করো ঠিকঠাক রঙ পেন্সিল লাগিয়ে একে রঙিন করে তোলো।



চারটে ড্রামই কি ঠিক একরকম? না। কোন্‌টা আলাদা?

দ্বিতীয় ড্রামের কাঠি একটু ছোটো।



(এর পরে আগামী সংখ্যায়)



দিলীপ দোশি
ফোটো: নিখিল ভট্টাচার্য

(পাতা ওলটালেই দিলীপের খবর)

আমাদের দিলীপ

পারিজাত

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়—'কতদিন যে বসেছিলেম, পথ চেয়ে আর কাল গুনে।' সত্যি, অনেকদিন। কতদিন? পাক্কা দশটি বছরের প্রতীক্ষা। ১৯৬৯-এ বাংলার অম্বর রায় ভারতীয় টেস্ট দলে খেলার সুযোগ পাবার পর দশটি বছর বাংলা তথা পূর্বাঞ্চল থেকে আর কোনও ক্রিকেটারের ভাগ্যে সেই সুযোগ জোটেনি। তাই যখন গত সেপ্টেম্বরে ভারতের অবশিষ্টাংশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ জানল, মাদ্রাজে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে নির্বাচিত দলে বাংলার দিলীপ রসিকলাল দোশিও আছেন, তখন বাঙালি মাত্রেই নির্মল আনন্দ অনুভব করেছেন। কারণ কাগজে-কলমে দিলীপ বাঙালি না হলেও, তাঁর জীবনের বৃহত্তর অংশ এবং ক্রিকেট জীবনের প্রায় সবটা কেটেছে কলকাতাতেই। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ, স্পোর্টিং ইউনিয়ন ক্লাব, বাংলা এবং পূর্বাঞ্চল দলের হয়ে খেলেই তিনি রচনা করেছেন তাঁর টেস্ট খেলার বুনিয়াদ। অবশ্যই এর সঙ্গে যুক্ত করতে হবে ইংল্যান্ডের নটিংহামশায়ার কাউন্টির নাম।

চশমা-পরা এই ন্যাটা স্পিনারটির জন্ম ১৯৪৭-এর ২২ ডিসেম্বর। সুতরাং টেস্টে সুযোগ পেয়েছেন একটু বেশি বয়সেই বলতে হবে। তাই সংশয় ছিল বাঙালির মনে, দিলীপ কতটা সফল হবেন। সময়ে সুযোগ পেলে তিনি নিশ্চয়ই দারুণ কৃতিত্ব দেখাতেন, এই কথাই বলাবলি করছিলাম আমরা সবাই। কিন্তু জীবনের প্রথম টেস্টেই দোশি প্রমাণ করে দিলেন যে, টেস্ট দলে তিনি ধারে ঢুকেছেন, ভারে নয়। দু'টি ইনিংসে আটটি উইকেট—যার মধ্যে ছিল অধিনায়ক কিম হিউজ, গ্রাহাম ইয়ালপ, গ্রেম উড এবং ডেভ হোয়াটমোরের উইকেট—নিয়ে এক ভারতীয় রেকর্ড করলেন। দোশির আগে প্রথম টেস্টে পাওয়া সর্বাধিক উইকেটের সংখ্যা ছিল সাত, পেয়েছিলেন ভি ভি কুমার আর আবিদ আলি। আর, প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে ছ'টি উইকেট দোশির আগে একমাত্র আবিদ আলি-ই পেয়েছিলেন।

এখানেই শেষ নয়। কিম হিউজের অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ছ'টি টেস্টে উইকেট-পিছু ২৩.৩৩ রান দিয়ে মোট ২৭টি উইকেট নিয়েছেন দোশি। ঐ সিরিজে ভারতীয় বোলারদের মধ্যে তাঁর উপরে ছিলেন শুধু কপিলদেব। সবচেয়ে বড় কথা, আর কোনও ভারতীয় জীবনের প্রথম টেস্ট সিরিজে এত উইকেট পাননি।

দোশি যে কেন এর আগে ভারতীয় দলে আসেননি, সেটা কারোই অজানা নয়। দোশির নিজের কথাতেই বলি—'রঞ্জি ট্রফিতে আমার প্রথম খেলার দু' বছর আগেই টেস্ট টীমে এসে গেছেন বিষেণ সিং বেদী—যাকে দুনিয়ার ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা পৃথিবীর সেরা ন্যাটা স্পিনার বলে অভিহিত করেছেন।' বেদী পথ আগলে থাকার জন্যেই টেস্ট ক্রিকেটের সিংহদ্বার থেকে বারবার ফিরে আসতে হয়েছে দিলীপকে। এখন মনে হচ্ছে, আমাদের নির্বাচকরা তখন এক-আধবার যদি সুযোগ দিতেন দিলীপকে, তা হলে হয়তো তাঁরা শেষ পর্যন্ত ভীষণ সমস্যাতে পড়তেন। সুযোগ দিলে দল থেকে তাঁকে বাদ দেওয়া শক্ত হত!

সুযোগ যে দেওয়া যেত না, তা নয়। রঞ্জি ট্রফিতে দিলীপ বরাবরই কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। প্রতি উইকেটে গড়ে ১৫.৪৪ রান দিয়ে ২৩৬টি রঞ্জি উইকেট দখল করেছেন। দলীপ ট্রফিতে উইকেট পেয়েছেন ৫২টি। আর ১৯৬৮-তে আমেদাবাদে কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার মূলেও দিলীপের কৃতিত্বই বোধহয় সব চেয়ে বেশি। সেবার তিনি ৩২টি উইকেট পান, ঐ প্রতিযোগিতায় অত বেশি উইকেট আর-কেউ পাননি।

দোশিকে দেখে, অর্থাৎ তাঁর সাধনা দেখে মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না। মিতবাক ও মৃদুভাষী এই যুবকটি কোনও দিন কাউকে দোষারোপ না করে নিষ্ঠার সঙ্গে নিজের কাজ করে গেছেন। এই তো, ১৯৭৮ সালেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে পূর্বাঞ্চল দল থেকে তাঁকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। তাতেও তিনি হতোদ্যম হননি। নিষ্ঠার স্বীকৃতি তিনি পেয়েছেন। এবং পেয়ে তাঁর যোগ্যতার প্রমাণ রেখেছেন। সেটাই বড় কথা।



আলির কথা, আলির কাজ

রঞ্জিতকুমার ঘোষ

১৯৬০-এর গ্রীষ্মের রাত। আমেরিকার ওহিও নদীর উপরের জেফারসন কাউন্টি ব্রিজে এক যুবক দাঁড়িয়ে। সে পকেট থেকে কী যেন একটা বার করে নদীতে ছুঁড়ে ফেলে দিল। চারদিকের নানারকম শব্দের মধ্যে ছোট্ট সেই শব্দ হারিয়ে যেতে-যেতে বস্তুটি নদীগর্ভে চলে গেল। মাত্র কয়েক মিনিট আগেই একটা লোক ছিনতাই করতে এসেছিল জিনিসটা। পারেনি। সে ভুল জায়গায় এসেছিল। কোনও-রকমে প্রাণ নিয়ে পালাতে পেরেছে। যুবকটি তার প্রিয় বস্তুটির জন্যে সর্বশক্তি দিয়ে লড়াই করেছিল। যেটাকে সে কখনও কাছছাড়া করেনি—খাওয়ার সময় বা ঘুমের সময়েও নয়। অথচ এমন জিনিস সে অবলীলাক্রমে নদীতে ফেলে দিতে পারল।

যুবকের পরিচয়? ক্যাসিয়াস মার্সেলাস ক্লে, পরবর্তীকালের মহম্মদ আলি ও বিশ্ব হেভিওয়েট খেতাব-বিজয়ী। বিশ্বের সর্বকালের সেরা মুষ্টিযোদ্ধাদের অন্যতম। আর, মূল্যবান বস্তুটি? অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, সেটি ছিল একটি অলিম্পিক স্বর্ণপদক। সেই বছরই রোমে লাইট-হেভিওয়েট বক্সিংয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়ে পেয়েছিলেন ক্লে। আলির নিজের কথাতেই বলি: "ছয়-ছয়টি বছরের রক্ত, ঘুষোঘুষি বেদনা ঘাম সংগ্রাম আর রিঙে ও জিমনাসিয়ামে হাজারখানেক রাউন্ড লড়াইয়ের বিনিময়ে পাওয়া ঐ মেডালটা। যে-পুরস্কার পাবার স্বপ্ন ছোটবেলা থেকেই দেখতাম। অথচ ওটাকে ফেলে দিয়ে আমার এতটুকু কষ্ট বা অনুশোচনা হয়নি। বরং অনুভব করলাম মুক্তির স্বাদ। আর, একটা নতুন শক্তি।"

বলা বাহুল্য, তখন পেশাদারি বক্সিংয়ের চুক্তিপত্র ক্লের পকেটে। কিন্তু তবুও যে-কাজটা তিনি সে-রাতে করেছিলেন, সেটা একমাত্র তাঁর পক্ষেই সম্ভব! এটাও যে একটা রেকর্ড তা একরকম জোর করেই বলা যায়।

কিন্তু মহম্মদ আলির সত্যিকারের রেকর্ডগুলোও কেউ কি কোনওদিন ভাঙতে পারবে? তিনি ছাড়া অন্য কোনও মুষ্টি-যোদ্ধা বিশ্ব হেভিওয়েট খেতাব তিন-তিনবার দখল করতে পারেননি। বক্সিং-রিঙ থেকে আলি যা উপার্জন করেছেন, তার কাছাকাছি কেউ কোনওদিন আসতে পারবেন কিনা সন্দেহ। ভারতীয় মুদ্রায় ৭০ কোটি টাকার মতো! আবার একটিমাত্র লড়াই থেকে সবচেয়ে বেশি পয়সা পেয়েছেন এই আলিই—৬,৫০০,০০০ ডলার—নর্টনের সঙ্গে ফিরতি লড়াইয়ে।

অপেশাদারি বক্সিংয়ে আলি (তখন ক্লে) ১৬৭টি লড়াইয়ের মধ্যে জিতেছিলেন ১৬১টি। তাঁর পেশাদারি বক্সিং জীবনের শুরু ১৯৬০-এর অক্টোবরে। প্রথম বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ পান ১৯৬৪-র ২৫ ফেব্রুয়ারি মিয়ামি বীচে সনি লিস্টনকে হারিয়ে। এই লড়াইয়ে লিস্টনই ফেভারিট ছিলেন। জুয়াড়িরা বাজি ধরেছিল ক্লের পক্ষে ৬—১, কারণ ক্লে-র জয়ের আশা কম। কেউ ১০০ ডলার খেললে ক্লে জিতলে সে পাবে ৬০০ ডলার। সাত রাউন্ডের পর লিস্টন একরকম পালিয়ে গেলেন। কিন্তু পরের বার (২৫ মে

১৯৬৫) তিনি প্রথম রাউণ্ডেই আলির কাছে হেরে যান। এর পর আলি এক-একে প্যাটারসন, চুভালো, হেনরি কুপার, মিল্ডেন-বার্জার, আর্নি টেরেল, জোরা ফলিকে হারিয়ে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুণ্ণ রাখলেন। কিন্তু ১৯৬৭-তে তাঁর জীবনে নেমে এল এক অভিশাপ। তিনি ভিয়েতনামে যুদ্ধে যেতে রাজি হলেন না। প্রকাশ্যেই বললেন, তিনি ঐ অন্যায় যুদ্ধ সমর্থন করেন না। সৈন্যদলে যোগ দিতে অস্বীকার করলেন। শাস্তি হিসাবে তাঁর বিশ্ব-খেতাব কেড়ে নেওয়া হল। শুধু তাই নয়, দশ হাজার ডলার জরিমানা ও পাঁচ বছর কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হল তাঁর বিরুদ্ধে। আলি আপিল করলেন। কিন্তু ১৯৬৭-র এপ্রিল থেকে ১৯৭০-এর সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তাঁকে কাটাতে হল নির্বাসনে।

আপিলে আলি জিতেছিলেন। মার্কিন সুপ্রীম কোর্টের আটজন বিচারক একমত হয়ে রায় দিয়েছিলেন যে, তাঁর বিরুদ্ধে দণ্ডাদেশ বে-আইনি। কিন্তু তার আগে আলির যে ক্ষতি হবার তা হয়েই গেছে, তাঁর বক্সিং জীবনের সেরা সময়েই সাময়িক ছেদ পড়ে গেছে। যা না ঘটলে তাঁর সেরা বক্সিং আরও কিছু দেখা যেত। আলির নিজের মত অবশ্য আলাদা। তিনি বলেন, "এতে আমার জনপ্রিয়তা বেড়েছে বই কমেনি। আর তাছাড়া, আমার সাময়িক অনুপস্থিতির সময় তৈরি হচ্ছিল জো ফ্রেজিয়ার, কেন নর্টন, জর্জ ফোরম্যানেরা, যাদের বিরুদ্ধে আমার বিরাট অঙ্কের অর্থের লড়াই হয়েছে। সুতরাং আর্থিক দিক থেকেও আমি লাভবান হয়েছি।''

দণ্ডাদেশ বাতিল হওয়ার আগেই (মার্চ, ১৯৭১) আলি ফ্রেজিয়ারের বিরুদ্ধে লড়েন, কিন্তু পঞ্চদশ রাউন্ড পর্যন্ত লড়েও রিঙের বিচারকদের সর্বসম্মত রায়ে হেরে যান। এটাই তাঁর পেশাদারি জীবনের প্রথম হার। দু' বছর বাদে (মার্চ ১৯৭৩) আলি আবার হারলেন—কেন নর্টনের কাছে, দ্বাদশ রাউণ্ডে। সেবার বিচারকরা একমত হননি। কিন্তু আলির চোয়াল ভেঙে গিয়েছিল। আলি খেতাব পুনরুদ্ধার করলেন ১৯৭৪ সালে জাইরের কিনহাসায় ফোরম্যানকে হারিয়ে। ১৯৭৮-এর ফেব্রুয়ারিতে লিয়ন স্পিঙ্কসের কাছে হেরে গিয়ে খেতাব আবার হারালেও ফিরতি লড়াইয়ে স্পিঙ্কসকে পয়েণ্টে হারিয়ে মুকুট ফিরে পেলেন রিঙের রাজা। শুধু স্পিঙ্কস কেন, নর্টন, ফ্রেজিয়ার লিস্টন, কুপার সকলের বিরুদ্ধেই দ্বিতীয়বার লড়াইয়ের সময় আলি প্রথমবারের চেয়ে ভাল করেছেন, জিতেছেন। আলির বিরুদ্ধে দ্বিতীয়বার কেউ জিততে পারেননি। তাই গত বছর ২৬ জুন যখন আলি অবসর নিলেন, বিশ্বের বহু নামকরা বক্সারই মনে মনে স্বস্তি অনুভব করেছেন।

ছোটবেলা থেকেই আলি বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হবার স্বপ্ন দেখতেন। সকলকে বলতেন, ''আমি ক্যাসিয়াস ক্লে। আমি বিশ্ব হেভি-ওয়েট চ্যাম্পিয়ন হব।'' তাঁর স্বপ্ন সফল



ফ্রেজিয়ারের ঘুষিতে আলি ধরাশায়ী। ফ্রেজার সেবারে পয়েণ্টে জিতে যান



নর্টনকে হারিয়ে আলি তাঁর বিশ্ব-খেতাব রক্ষা করছেন

হয়েছে। অথচ কেনটাকির লুইভিলে যে দরিদ্র কৃষ্ণাঙ্গ খ্রীস্টান পরিবারে তাঁর জন্ম (১৭ জানুয়ারি, ১৯৪২), তার সঙ্গতি বলতে কিছুই ছিল না। ক্যাসিয়াসের বাবা সাইন-বোর্ডের ছবি আঁকতেন আর মা এক ধনী শ্বেতাঙ্গের বাড়ির যাবতীয় কাজ করতেন। পুরনো বাড়ি। ছাদ দিয়ে, দেওয়াল দিয়ে বর্ষার জল পড়ত। দুই ভাই ক্যাসিয়াস ও রুডলফের সর্বদিন পেট ভরে খাওয়া জুটত না। সেকেন্ড-হ্যান্ড জুতো পরত দু ভাই। স্কুল-বাসে যাবার পয়সা ছিল না। স্কুলবাসের পাশে ছুটে ছুটে যেতেন ক্যাসিয়াস। পরিশ্রম আর নিষ্ঠার বলেই সেদিনের ক্যাসিয়াস ক্লে আজকের মহম্মদ আলি হতে পেরেছেন।

আলি ছোটদের দারুণ পছন্দ করেন। আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছেন— আমি শিশুদের ভালবাসি। ওদের সঙ্গে কিছু কথা না বলে ওদের সামনে দিয়ে চলে যেতে আমি কিছুতেই পারি না। ওরাই সকলকে নতুন করে জীবন শুরু করার প্রেরণা জোগায়।

নর্টনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পর আলি যখন মিশিগান ইউনিভার্সিটির ডাঃ রীড ডিংম্যানের কাছে চোয়াল পরীক্ষা করাতে গিয়েছিলেন, তখন এক শ্বেতকায় মহিলার অনুরোধে নিউরোলজি ওয়ার্ডে তাঁর পক্ষাঘাতগ্রস্ত ছেলেকে দেখতে যান। যখন জানলেন যে, ছেলেটি আর কোনওদিন উঠতে পারবে না, তখন আলি খুবই মানসিক যন্ত্রণা অনুভব করেছিলেন। বলেছিলেন, ওর কষ্টের কাছে আমার চোয়ালের ব্যথা কিছুই নয়।

আরও অনেক পরের কথা। আলির জীবনীচিত্র 'দা গ্রেটেস্ট'-এর শুটিং চলছে। যে-অভিনেত্রীটি আলির স্ত্রী বেলিন্ডার ভূমিকায় অভিনয় করছিলেন, একটি দৃশ্যের প্রয়োজনে তাঁর চোখে জল। পাশে দাঁড়িয়েছিলেন আলি। "আরে, এটা যে সত্যিকারের চোখের জল দেখছি!" বলে তাঁর মুখ মুছিয়ে দিলেন। ভদ্রমহিলা হাসবেন না কাঁদবেন ভেবে পেলেন না।

এ-রকম লোকের উপর রাগ করে থাকা যায় না। তাই তাঁর জনপ্রিয়তা প্রচন্ড। একবার এক হাসপাতাল থেকে তাঁর এক্স-রে প্লেটই চুরি হয়ে গেল—স্মারক হিসাবে রাখবার জন্যে ওটাকে কেউ সরিয়েছিল!

এক্স-রে প্লেটের কথায় মনে পড়ে গেল আর-একটা ঘটনার কথা। নর্টনের ঘুষিতে চোয়াল ভাঙার পর যে-সব ডাক্তার আলিকে পরীক্ষা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন লন্ডনের এক ডাক্তার। তিনি আলিকে অনুরোধ করলেন কয়েকটা এক্স-রে প্লেটে স্বাক্ষর করতে। বিস্মিত আলি প্রশ্ন করায় তিনি বললেন, "লন্ডনে ছেলেরা বিশ্বাসই করবে না যে কেউ আলির চোয়াল ভাঙতে পারে, তাই।"

চুপিচুপি একটা কথা বলে দিই। একটা জিনিসকে আলি ভীষণ ভয় করেন। রিঙে কত মার দিয়েছেন, কত খেয়েছেন! কিন্তু ইঞ্জেকশান নিতে তাঁর ভীষণ ভয় (কয়েক শ' ইঞ্জেকশান নিয়েও)। তোমাদেরই অনেকের মতো, তাই না?



প্রসূন ব্যানার্জি

বাংলা ! বাংলা !

অশোক দাশগুপ্ত

কোয়েম্বাটোরে হোটেল শ্রীমুরুগনের দুশো তিন নম্বর ঘরে আলোচনাটা তখন যথেষ্ট গরম। যে-কোনো পরিবেশেই আজকের ভারতীয় ক্রিকেট দল পাকিস্তানের চেয়ে কম যায় না—আমার এই ধারণার সঙ্গে চিন্ময় চ্যাটার্জি মোটেই একমত নন। দুঁদে সাইড-ব্যাক চিন্ময় ক্রিকেটেও মন্দ খেলেন না, আর তর্কে তো যথেষ্ট ওস্তাদ। কিন্তু ঘরের তৃতীয় ব্যক্তি প্রায় চুপচাপ। তাঁর ঐ এক কথা : "আমি ক্রিকেট-টিকেট বুঝি না।" ফুটবল নিয়ে গম্ভীর তর্ক উঠলেও তিনি বলবেন, "আমি অত বুঝি না।" কিছুই বোঝেন না, তবু কোয়েম্বাটোরে ছত্রিশতম জাতীয় ফুটবলের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হলেন ঐ ভাস্কর গাঙ্গুলি। গত আরব সফরে চমৎকার খেলে এসেছেন। এবার সন্তোষ ট্রফির প্রথম দুটি ম্যাচে বাংলার গোলে তেমন বল আসেনি। কিন্তু কোয়ার্টার ফাইনাল লীগ থেকেই ভাস্করকে শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিতে হয়। গোয়ার সঙ্গে দুই দফার সেমি ফাইনাল বাংলা যখন ১—১ গোলে শেষ করল, আমরা ভাস্করের দিকে তাকালাম। আই এফ এ শীল্ড সেমি ফাইনালে তুমিই তো টাইব্রেকারে বিরাট হয়ে উঠে দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধে ইস্টবেঙ্গলকে জিতিয়েছিলে, আজ পারবে না ? প্রায় অবিশ্বাস্য দক্ষতায় দুটি পেনাল্টি কিক রুখে দিয়ে বাংলাকে ফাইনালে তুলে দিলেন ভাস্কর। আর ফাইনালের প্রথমার্ধেই এক পোস্ট থেকে আর এক পোস্টে পাখির মতো উড়ে গিয়ে যখন বল নিয়ে মাটিতে নামলেন, টুর্নামেণ্টের সেরা খেলোয়াড়ের নির্বাচন নিয়ে তখন আর কোনো সংশয় থাকল না। হাতঘড়ি পেলেন, পেলেন অন্য পুরস্কার, কত অভিনন্দন, তবু ভারতের সরল হাসিখুশি এক নম্বর গোলকীপারের এক কথা : "আমি অত বুঝি না।"



ভাস্কর গাঙ্গুলি ফোটো নিখিল ভট্টাচার্য

ক্লাস্টারে বাংলার সঙ্গে ছিল জম্মু ও কাশ্মীর এবং পণ্ডিচেরি। জম্মু ও কাশ্মীর হারল তিন গোলে। পণ্ডিচেরিও তাই। দুদিনই দুটি করে গোল করলেন সাব্বির। বাকি গোল পেলেন জম্মু ও কাশ্মীরের বিরুদ্ধে ডেভিড উইলিয়ামস এবং পণ্ডিচেরির বিরুদ্ধে মানস ভট্টাচার্য।

কোয়ার্টার ফাইনাল লীগের প্রথম ম্যাচে কর্ণাটকের সঙ্গে মুখোমুখি হওয়ার আগেই কোয়েম্বাটোরে পৌঁছে গেলেন সুব্রত ভট্টাচার্য এবং সুরজিৎ সেনগুপ্ত। চমৎকার খেললেন শ্যামল ব্যানার্জি। বাংলা জিতল মানসের দেওয়া একমাত্র গোলে। সুরজিৎ সেনগুপ্তের ফ্রীকিক সাব্বিরের মাথা হয়ে মানসের পায়ে পড়তেই গোল।

পরের ম্যাচে অন্ধ্রের বিরুদ্ধে ঝড়ের গতিতে খেলা শুরু করে বাংলা এগিয়ে গেল ছয় মিনিটের মাথায়। মানসের সেন্টারে হেড করলেন বিদেশ বসু। গোলে ঢোকার মুখে হাত দিয়ে বল থামালেন অন্ধ্রের গোলকীপারের বদলে রাইট স্টপার আলেম খান। পেনাল্টি কিকের সদ্ব্যবহার করলেন বিদেশ। বিরতির

সময় আরব-সফরে-চোট-পাওয়া হাঁটুতে আবার চোট পেয়ে বসে গেলেন সুরজিৎ সেনগুপ্ত। খেলা শেষের তিন মিনিট আগে গা-ছাড়া খেলার জব্বাব পাওয়া গেল ঃ অন্ধ্রের মুজ্যুফ্ফর দর্শনীয় গোল করে ১—১ করে দিলেন।

কোয়ার্টার ফাইনাল লীগের শেষ ম্যাচে কেরলের সঙ্গে খেলা গোলশূন্য রেখে বাংলা সেমি ফাইনালে উঠল। এইদিন ভাস্কর কিছু কঠিন পরিস্থিতির সামাল দিলেন। শ্যামল ব্যানার্জি এবং বিদেশ বসুও বেশ খেললেন।

লড়িয়ে টীম গোয়ার বিরুদ্ধে প্রথম সেমি ফাইনালের খেলা শুরু হল নাটকীয় ভাবে। চার মিনিটের মাথায় গোল করলেন জেভিয়ার পায়াস। বিদেশ বসুর কর্নার সাব্বির আলির মাথা ছুঁয়ে গোয়ার লেফট ব্যাক ড্যানিয়েলের দিকে যায়। ড্যানিয়েলের সামান্য দ্বিধার সুযোগে ছুটে গিয়ে চকিত শটে গোল পান জেভিয়ার পায়াস। জাতীয় ফুটবলে এটি বাংলার ৫০০তম গোল। এই দিন দুর্দান্ত খেললেন ভাস্কর গাঙ্গুলি। জেভিয়ার পায়াসও মন্দ খেলেননি।

তবে পায়াস তাঁর শ্রেষ্ঠ খেলা মজুত রেখেছিলেন দ্বিতীয় দফার সেমি ফাইনালের জন্য। এইদিন খেলার শুরুতেই গোল দিয়ে গোয়া মোট ফল ১—১ করে নেয়। রোজারিওর কর্নার কিক মাটিতে পড়ার মুখে নিখুঁত ভলি নিয়ে গোল করে যান লিংকম্যান আর্মান্ডো। এর পর বাংলা খেলা ধরে প্রধানত জেভিয়ার পায়াসের নেতৃত্বে। পায়াসের পাসগুলো গোয়ার রক্ষণভাগকে ফালাফালা করে চিরতে থাকে। মানস-বিদেশ ডানা মেলেন। আর পিছন থেকে দুর্দান্ত হয়ে উঠে আসতে থাকেন চিন্ময় চ্যাটার্জি। তবু বাংলা গোল পায়নি।

গোয়ার চারটি পেনাল্টি কিকের মধ্যে দুটিই রুখে দেন ভাস্কর গাঙ্গুলি। বাংলার হয়ে গোলে বল পাঠান চিন্ময় চ্যাটার্জি, সুব্রত ভট্টাচার্য, মানস ভট্টাচার্য এবং জেভিয়ার পায়াস। ৪—২ হয়ে যাওয়ায় পঞ্চম পেনাল্টি কিক আর নির্তে হয়নি।

অন্য দিকে প্রথম দফার সেমি ফাইনাল গোলশূন্য হলেও, দ্বিতীয় ম্যাচে কর্ণাটক পাঞ্জাবের কাছে হেরে যায় পরিষ্কার তিন গোলে।

সত্তর এবং চুয়াত্তরে পাঞ্জাবের মাটিতে বাংলাকে হারিয়ে সন্তোষ ট্রফি ঘরে তুলেছিল পাঞ্জাব। সাতাত্তরে কলকাতায় পাঞ্জাবকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল বাংলা। এবার প্রথম এই দুটি দল ফাইনাল খেলল নিরপেক্ষ কোনো রাজ্যে। আগের খেলাগুলোয় বাংলা খুব ভাল খেলেনি। তবু খেলার দিন সকালে অধিনায়ক প্রসূন ব্যানার্জি বললেন, "প্রয়োজনে খেলা তুলে ধরতে আমরা জানি। আমরা জিতবই।" সত্যিই, অনবদ্য ফুটবল খেললেন প্রসূন ব্যানার্জি। গোটা টীমকে অনুপ্রাণিত করলেন। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য এবং পায়াসও ভাল খেললেন। মানস আর বিদেশ যথার্থই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠে পাঞ্জাবের দুই সাইড-



ফোটো শান্তি সেন

ব্যাককে নাজেহাল করে দিলেন। বত্রিশ মিনিটের মাথায় প্রসূনের বাঁ পায়ের নির্ভুল সেন্টার সাব্বির বুক দিয়ে নামান। ফ্লাইটে পরাজিত সুখবিন্দার সিং শেষ চেষ্টা করার জন্য পা চালাতেই বল জালে জড়ায়। বিজয়ীর ভঙ্গিতে হাত তুলে নাচতে-নাচতে প্রসূনের দিকে ছুটে আসেন সাব্বির।

পরপর পাঁচবার সন্তোষ ট্রফি জিতে বাংলা রেকর্ড করল। আবার প্রমাণিত হল ভারতীয় ফুটবলে বাংলা নিঃসন্দেহে এক নম্বর। সেরা ফুটবলার ভাস্কর গাঙ্গুলি পুরস্কারের হাতঘড়িটা দেখিয়ে বললেন, "এটা দেব আমার গুরু সুধাদাকে!"



কপিলের বলে ইকবাল কাশিমের স্টাম্প উড়ে গেছে
ওয়াসিম রাজা। চতুর্থ টেস্টের প্রথম ইনিংসে



কানপুর-টেস্ট ড্র

অলোক দাশগুপ্ত

কানপুরে একটি রাজকীয় ইনিংস উপহার দিলেন ওয়াসিম হাসান রাজা। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ব্যাট করতে নেমে নিজেকে অযথা গুটিয়ে রাখেননি পাকিস্তানের এই ন্যাটা ব্যাটসম্যান। পাল্টা আক্রমণ চালিয়েছেন ভারতীয় বোলারদের উপর। কখনও ডান পায়ের উপর ভর দিয়ে পিছনে হেলানো শরীর সামান্য উপরে তুলে সপাটে স্কোয়ার কাট, কখনও পিছনের পায়ে ভর দিয়ে চোস্ত কভার ড্রাইভ, কখনও বা কেতাবি হুক এবং পুল— রাজার ব্যাট থেকে মারের ফুলঝুরি বেরিয়েছে গ্রীন পার্ক মাঠে।

রাজা তাঁর সহযোগী হিসেবে পেয়েছিলেন দলের তিন টেল-এন্ডার ইকবাল কাশিম, সিকান্দার বখত এবং এহেতাসামুদ্দিনকে এবং এঁদের সঙ্গে জুড়ি বেঁধে পাকিস্তান স্কোরকে উনি টেনে নিয়ে গেছেন ১৩২ থেকে ২৪৯ রানে। অবশ্য যে-ভাবে কাশিম প্রায় দু'ঘণ্টা ক্রীজ আঁকড়ে ছিলেন এবং টেস্ট ক্রিকেটে তাঁর ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ স্কোর ৩২ করেছেন, তাতে তাঁর প্রশংসা না করলে অন্যায় হবে। রাজা এবং কাশিম অষ্টম উইকেটে ৮২ রান যোগ করেছেন; মূলত এই জন্যেই পাকিস্তান প্রথম ইনিংসে ৮৭ রানে এগিয়ে গেছে। রাজার নিতান্ত দুর্ভাগ্য, মাত্র ছয় রানের জন্য তিনি একটি শতরান থেকে বঞ্চিত হলেন।

চতুর্থ টেস্টের প্রথম দিনটা ছিল মেঘলা। গাছপালায় ঘেরা গ্রীন পার্কে জোরালো বাতাস বইছিল। পিচও ছিল যথেষ্ট সবুজ। অতএব এমন পরিস্থিতিকে পেস বোলাররা কাজে লাগাবেন, তা জানা কথা। কিন্তু সিকান্দার বখত বা এহেতাসামুদ্দিনের বল এমন কিছু ভয়ঙ্কর ছিল না যে, ভারতীয় ইনিংস চরম দুর্দশায় পড়বে। পাকিস্তানের দুই পেসার ভারতীয়দের অফ এবং মিডল স্টাম্প লক্ষ করে অনবরত বল করে গেছেন। ভারতীয় ব্যাটসমানদের অনেকেই, যেমন বেংসরকার, বিশ্বনাথ, কপিলদেব, কিরমানি অবিবেচকের মতো ব্যাট চালিয়ে প্যাভিলিয়নে

ফিরে এসেছেন। মাত্র ১৭ রানের মধ্যেই গাভাসকার, বিশ্বনাথ সহ ভারতের সেরা চারজন ব্যাটসম্যান আউট—সম্প্রতি এমন দুরবস্থা ভারতের কখনও ঘটেনি, ঊনসত্তর রানে যখন আটজন খেলোয়াড় বিদায় নিলেন তখন অনেকেই ধরে নিয়েছিলেন ১০০ রানের মধ্যেই ভারতের ইনিংস খতম হবে। কিন্তু ঘাউড়ি, যাদব এবং দোশি তা হতে দেননি। রান টেনে নিয়ে গেছেন ১৬২-তে। ঘাউড়ির ব্যাটিংয়ে মোটামুটি খ্যাতি আছে, অতএব তাঁর কাছ থেকে ৪৫ রান মোটেই অপ্রত্যাশিত নয়। কিন্তু যেভাবে যাদব এবং দোশি পাকিস্তান বোলারদের মোকাবিলা করেছেন এবং পূর্ববর্তী নামী ব্যাটসম্যানদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, লড়িয়ে মেজাজ নিয়ে খেললে এই উইকেটে টিঁকে থাকা অসম্ভব নয়, তা প্রশংসার দাবি রাখে।

সিকান্দর এবং এহেতেসাম দু'জনেই পাঁচটি করে উইকেট দখল করেছেন, যা তাঁদের নিশানা ঠিক রেখে এবং বুদ্ধি করে বল করার ফসল। ওঁরা উপযুক্ত সাহায্য পেয়েছেন ফীল্ডসম্যানদের কাছ থেকে। মুদাস্সার নজরের দু'টি ক্যাচই ছিল দর্শনীয়। বিশেষ করে স্লিপে ডানদিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে শূন্যে কপিলের যে ক্যাচটা নিয়েছেন, তা অনেক নামী গোলরক্ষকেরও ঈর্ষার বিষয়। জাভেদ এবং আসিফ যে-রকম দ্রুতগতিতে দৌড় দিয়ে বাউন্ডারি বাঁচিয়েছেন তাতে মনে হয়েছে ওঁরা ১০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতায় অনায়াসে যোগ দিতে পারেন।

ভারতীয় দ্বিতীয় ইনিংসে কর্তৃত্ব করতে দেখলাম সুনীল গাভাসকারকে। পরপর কয়েকটা ইনিংসের ব্যর্থতাকে মুছে ফেলতে, যেন উনি বদ্ধপরিকর হয়ে মাঠে নেমেছিলেন। তৃতীয় দিনের প্রায় দু'ঘন্টা গাভাসকার যা ব্যাট করেছেন অত ভাল ব্যাট করতে ওঁকে সম্প্রতি দেখিনি।

এটা কিছুটা দুর্ভাগ্যই যে, গাভাসকার ১৯ রানের জন্য ওঁর ২৩তম শতরানটি পেলেন না, কারণ মুদাস্সার স্কোয়ার লেগে দাঁড়িয়ে ওঁর তীব্র শর্টটি যে-ভাবে লুফে নিলেন তা প্রায় অবিশ্বাস্য। গাভাসকার বা বিশ্বনাথের ছোট আক্রমণাত্মক ইনিংসের পাশাপাশি বড়ই বেখাপ্পা লেগেছে চৌহান এবং বেংসরকারের ঘুমপাড়ানি ব্যাটিং। বেংসরকারকে দেখে মনে হচ্ছিল সব স্ট্রোক যেন ভুলে গেছেন। ১৪৫ মিনিটে মাত্র ১৬ রান সত্যিই বিরক্তিকর।



সুনীল গাভাসকার। চতুর্থ টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে মারমূর্তি ধরেছিলেন

এই টেস্টে ভারতীয়দের আর একটি গর্বের বিষয় কপিলদেবের বোলিং। ৬৩ রানে ছয়টি উইকেট দখল করে উনি নিজের সেরা বোলিংয়েরই শুধু নজির রাখেননি, সঙ্গে সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার গ্রাহাম ম্যাকেঞ্জির গড়া এক ক্যালেণ্ডার-বর্ষে সর্বোচ্চ ৭১টি উইকেটের রেকর্ডটাও ভেঙে দিয়েছেন। কপিলের ১৯৭৯-তে সংগ্রহ ৭৪টি উইকেট।

পিচ ভিজে থাকায় চতুর্থ টেস্টের পঞ্চম দিনের খেলা হয়নি। মাটিতে ত্রিপল বিছিয়ে পিচ ঢাকার ব্যবস্থা হয়েছিল, যা টেস্ট-ক্রিকেটের পক্ষে হাস্যকর ব্যাপার। রাতে ঝোড়ো হাওয়ায় হয়তো ত্রিপল উল্টে গেছে এবং জল চুঁইয়ে পিচে ঢুকেছে। শেষ দিনে মাঠে হাজির হয়ে দেখলাম সমস্ত আউট ফীল্ড শুকনো, কিন্তু পিচের এক জায়গায় বিশ্রী কাদা হয়ে আছে। ঐ পিচে খেলা যায় না। খেলা হলেও নির্দ্বিধায় বলা যায়, চতুর্থ টেস্ট ড্র-ই হত। কিন্তু মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোকের গাফিলতির জন্য ভারতীয় ক্রিকেটের সুনাম নষ্ট হল। একইসঙ্গে বলব, পাকিস্তানের সুনাম নষ্ট করেছেন সিকান্দার বখত। বেংসরকারের বিরুদ্ধে 'কট বিহাইণ্ড'-এর দাবি আম্পায়ার নাকচ করে দেওয়ায় বোলার সিকান্দর যেভাবে লাথি মেরে উইকেট ভেঙে দেন, তা সকলেরই ধিক্কার কুড়িয়েছে।



পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের সই চেয়েছিলে তো? এই নাও

গঙ্গা

দিদিমণি

উত্তর ভারতের সমতলভূমির ওপর দিয়ে প্রবাহিত প্রধান নদী গঙ্গা। প্রায় সমস্ত গতি-পথেই নদীটি চওড়া। উত্তর ভারতে এই নদীর গুরুত্ব খুব বেশি হলেও এর দৈর্ঘ্য মাত্র ২,৫০৬ কিলোমিটার। এশিয়ার দীর্ঘতম নদীগুলির মধ্যে এর স্থান পঞ্চদশ, পৃথিবীতে ৩৯তম।

হিমালয় থেকে বেরিয়ে এই নদী বঙ্গোপ-সাগরে পড়ছে। উপত্যকায় বাস করে তিরিশ কোটি মানুষ—এই জনসংখ্যা চীন ছাড়া যে-কোনো রাষ্ট্রের জনসংখ্যার চেয়ে বেশি।

গঙ্গা ভারতে প্রবাহিত হলেও এর বদ্বীপের বেশির ভাগ অংশটি পড়েছে বাংলা-দেশে।। গতিপথ উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে। বিহারের রাজমহল পাহাড় ঘিরে বয়ে গিয়ে এই নদী পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করে ধুলিয়ানের কাছে দুটি শাখায় ভাগ হয়ে যায়। প্রধান ধারাটি পদ্মা নামে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। অন্য ধারাটি দক্ষিণে বেঁকে পশ্চিমবঙ্গে ভাগীরথী নামে বয়ে যাচ্ছে। মোহনার কাছে কলকাতার এই নদীর নাম হুগলি।

গঙ্গার উৎসভাগের পাঁচটি প্রধান নদী ভাগীরথী, অলকানন্দা, মন্দাকিনী, ধৌলী গঙ্গা এবং পিন্ডার। উত্তরপ্রদেশের উত্তরাখন্ড বিভাগ থেকে বেরিয়েছে। গঙ্গার আসল উৎস গোমুখ, গঙ্গোত্রী হিমবাহের তেরো মাইল দক্ষিণে। অলকানন্দা ও ভাগীরথী দেবপ্রয়াগে এসে মিশে যাওয়ার পর নাম হয়েছে গঙ্গা। হৃষীকেশে এই নদী পার্বত্য অঞ্চল কেটে বাইরে বেরিয়ে আসছে এবং হরিদ্বারে এসে সমতলভূমিতে পড়ছে।

উপনদীগুলির মিলনে এবং বৃষ্টিবহুল অঞ্চলের মধ্য দিয়ে প্রবহনকালে গঙ্গায় জলের পরিমাণ বেড়ে যায়। এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত এই নদী হিমালয়ের বরফগলা জলে পুষ্ট হয়, জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রচুর বৃষ্টি-পাতের জন্যে কখনও কখনও বন্যা দেখা দেয়।

উত্তরপ্রদেশে গঙ্গার ডান তীরের প্রথম ও প্রধান উপনদী যমুনা। দিল্লির পাশ দিয়ে বয়ে গিয়ে এলাহাবাদে গঙ্গার এসে মিশেছে।



এরপরে বিন্ধ্য পর্বত থেকে এসে মিশেছে টোঁস (তমসা)নদী। উত্তর ভারতের বাঁ তীরে প্রধান উপনদীগুলি হল রামগঙ্গা, গোমতী, গন্ডক, ঘর্ঘরা ও কুশী। দক্ষিণ দিকের উপ-নদীর মধ্যে শোন প্রধান। পশ্চিমবঙ্গে উত্তর দিক থেকে এসে মিশেছে মহানন্দা। হুগলির উপনদীগুলির মধ্যে দামোদর প্রধান।

বদ্বীপ : বদ্বীপ অঞ্চলে গঙ্গা ও তার শাখানদীগুলি প্রায়ই গতিপথ পরিবর্তন করে। পশ্চিমবঙ্গের নীচের দিকে ও বাংলাদেশ জুড়ে হুগলি, পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্র বাহিত পলি দিয়ে গড়া বদ্বীপই পৃথিবীর বৃহত্তম বদ্বীপ। নদী-গুলি যেখানে নানা শাখায় বিভক্ত হয়ে বঙ্গো-পসাগরে এসে পড়েছে সেখানে পলিমাটি জমে জমে অনেক চর ও দ্বীপের সৃষ্টি হয়েছে। নদীর মোহনায় জল-জঙ্গল সুন্দরবন খুবই বিখ্যাত।

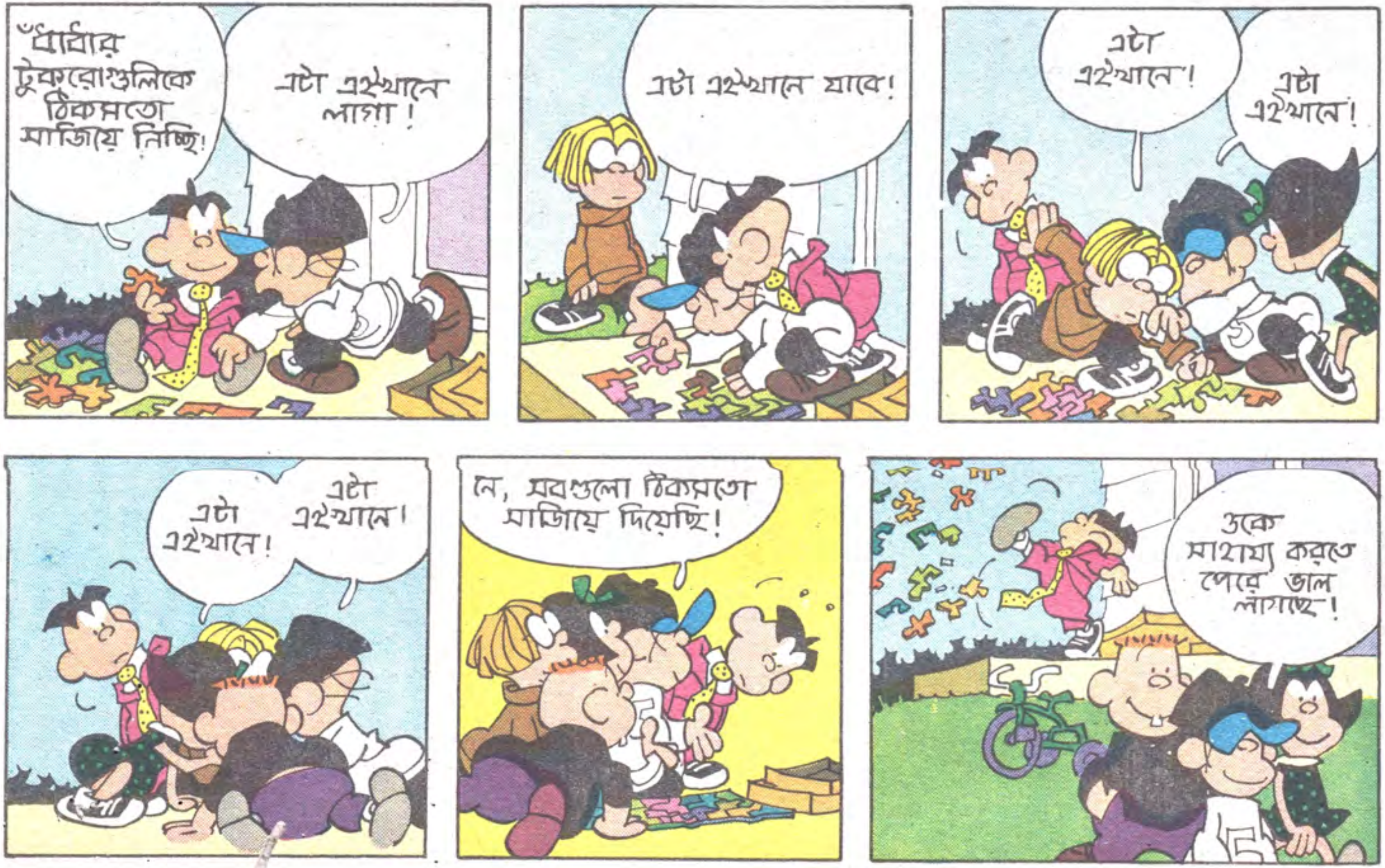
জলবায়ু : গঙ্গা মৌসুমী জলবায়ু অঞ্চলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। শীতকাল প্রায় বৃষ্টিহীন। পশ্চিমে শীত-গ্রীষ্ম বেশি এবং বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম। যতই পূর্বে যাওয়া যায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বাড়তে থাকে এবং শীত-গ্রীষ্মের তাপমাত্রার তফাতও কমতে থাকে।

শহর : গঙ্গার দুই তীরে অনেক শহর। কানপুর, এলাহাবাদ, বারাণসী, পাটনা ভাগলপুর, মুর্শিদাবাদ, কলকাতা ও হাওড়া উল্লেখযোগ্য।

জলসেচ : গঙ্গা ও উপনদীগুলি থেকে কৃষিকার্যের জলসেচের জন্যে অনেক খাল কাটা হয়েছে। কৃষিকার্যই নদী উপত্যকার অধি-বাসীদের প্রধান জীবিকা।

জলপথ : রেলপথ ও স্থলপথ তৈরি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জলপথ হিসেবে এই নদীর গুরুত্ব কমে গেলেও নিম্নভাগে এখনও গুরুত্ব রয়েছে।

বাঘা ১



ধাঁধার টুকরোগুলিকে ঠিকমতো সাজিয়ে নিচ্ছি!
এটা এইখানে লাগা!
এটা এইখানে যাবে!
এটা এইখানে!
এটা এইখানে!
এটা এইখানে!
এটা এইখানে!
নে, সবগুলো ঠিকমতো সাজিয়ে দিয়েছি!
ওকে সাহায্য করতে পেরে ভাল লাগছে!

বাঘা ২


ঝাঁঝরির মধ্যে একটা সিকি পড়ে গেছে। কী করে তুলব?
আমি তুলে দিচ্ছি!
বটে?
লাঠির মাথায় আঠা লাগিয়ে নিলুম!
আরও আঠা চাই!
এই নে তোর সিকি!
বাঃ, এর জন্যে তোকে কত মজুরি দেব?
এক আধুলি!

মন চাই, মন

কুন্তক

দেখো কাকু, ছোটবেলা থেকে বাবার কাছে শুনেছি 'চোখ কান সব খোলা রাখবি'। তুমি কি এর বিরুদ্ধে?

কেন? এর বিরুদ্ধে কেন হব?

তবে অত মন-মন করছ কেন? দেখে-শুনেই তো মেলাব। 'পাখির নীড়ের মতো চোখ' বললে কি এই বোঝায় না যে চোখটা পাখির বাসার মতোই দেখতে?

ও, জীবনানন্দের সেই লাইনটার কথা বলছিস?

সে কি আর তুমি বুঝতে পারছ না? সেটাই বলছি।

এ তো গায়ে পড়ে ঝগড়া করছিস। চোখ কান তো রইলই, তাই বলে মনটাকে কি আর বাদ দেয় কেউ? আচ্ছা, একটা মেয়েকে যদি গাছ বলা যায় তো কেমন হয়? ধর্, তুলসী গাছ?

মেয়েটার নাম কি তুলসী?

নামটা তুলসী হলেই কি সে তুলসী গাছের মতো হত দেখতে? না, নামটাও তুলসী নয়। নাম, ধর্, সীতা।

সীতা?

'মেঘনাদবধ কাব্য' পড়েছিস? অশোক-বনে বন্দিনী সীতার কথা? নানা অলংকারে সেজে রূপবতী সরমা এসে বসেছেন নির-লংকার সীতার পায়ের কাছে। সরমাকে মনে আছে তো? বিভীষণের বৌ। মধুসূদন বলছেন :

> আহা মরি, সুবর্ণ-দেউটি
> তুলসীর মূলে যেন জ্বলিল, উজলি'
> দশদিশ।

টুম্পি বলল : বাঃ, সুন্দর।



কিন্তু ব্যাপারটা কী হল? সরমা কি দেখতে প্রদীপের মতো? না কি সীতাকেই তুলসী গাছের মতো দেখতে?

এঃ, তুলসী গাছের মতো দেখতে কেন হবে?

তবে? তবু তো সুন্দর লাগল কথাটা? আসলে, তুলসীর সঙ্গে আমাদের একটা স্নিগ্ধতার শুচিতার ভাবনা জড়িয়ে থাকে না? একটা বললেই অন্যটার কথা মনে হয় না? সেই ভাবনাটা এসেই সীতার সঙ্গে মিলিয়ে দিল তুলসীকে, মনে গেঁথে গেল লাইনটা। এ তো লেখা হয়েছিল কবে, সেই একশো বছরেরও আগে।

নন্তু বলল : এক-আধটা হয়ে যায় ও রকম।

এক-আধটা? আচ্ছা, রবীন্দ্রনাথে আয়। 'অভিসার' কবিতাটা মনে আছে তো?

সন্ন্যাসী উপগুপ্ত? মথুরাপুরীর প্রাচীরের তলে একদা ছিলেন সুপ্ত। এ আর কে না জানে?

সেই উপগুপ্তকে বাসবদত্তা দেখছে 'শুভ্র ললাটে ইন্দু সমান ভাতিছে স্নিগ্ধ শান্তি'। এ কি আর সেই চাঁদের মতো কপাল বলা হল? মনে যে শান্তি এনে দেয় জ্যোৎস্না, তার কথাই কি হল না? কিংবা ধর্, 'পরিশোধ' কবিতায় শ্যামাকে দেখে যখন বজ্রসেন বলছে 'শুভ্র উষা সম/কে তুমি উদিলে আসি কারাকক্ষে মম'—

কী হচ্ছে তখন? এ তো বলা হচ্ছে যে শ্যামা ভোরের মতো দেখতে।

শুধু কি ওইটুকুই? রাতের পর সকাল যেমন মুক্তি এনে দেয়, বজ্রসেনের কি মনে হল না, তার সামনে শ্যামাও তেমনি মুক্তি হয়ে এল?

টুম্পি জিজ্ঞেস করল : ঘর থেকে বাইরে নিয়ে যাবার জন্য? আর জীবনানন্দের পাখির নীড়?

সে হল বাইরে থেকে ঘরে নিয়ে যাবার জন্য। অনেক ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়েছে একজন। একটি মেয়ের চোখের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে তার, এই তো শান্তি, এই তো আশ্রয়। পাখি তো খুঁজে পেল তার নীড়। এ তো কেবল দেখা নয়। এর জন্য যে মন চাই, মন।

তোমাদের লেখা

প্রসাদ

কোথায় ছিল চামেলি, যখন বাগানে তার দাদা বন্ধুদের নিয়ে খাওয়া-দাওয়া আর হৈ-হুল্লোড় করছিল? কী করছিল সে? ৭ই নভেম্বর ১৯৭৯ তারিখের আনন্দমেলায় এই নিয়ে কয়েকটি প্রশ্ন তোমাদের দিয়েছিলাম, মনে আছে তো? তোমরা অনেকে সে-সব প্রশ্নের উত্তর পাঠিয়েছ। তার মধ্যে কয়েকজনের লেখা বেশ ভাল হয়েছে। এবার তাদের নাম ছাপার পালা। কিন্তু তার আগে এ-বিষয়ে দু'-চারটি কথা বলে নিই।

প্রশ্নের উত্তর অনেক সময়ে খুব সংক্ষেপেও দেওয়া যায়, আবার একটু বেশি খবর-টবর দিয়ে উত্তরটাকে একটু বড়ও করা যায়। যেমন ধরো, প্রথম প্রশ্নটার উত্তর রবি, আবীর মহুয়া আর অদিতি, এক-একজন এক-এক রকম দিয়েছে।

Q. Where was Chameli?

Ans. (1) *Chameli was in her room.* (Abir)

(2) *Chameli was in her room* when it was raining. (Ruby)

(3) Like all the others, *Chameli* too *was in the garden.* (Mahua)

(4) *Chameli was* out *in the garden* with her brother Chambal and the other children. (Aditi)

এদের প্রত্যেকেই ভাল লিখেছে, কেননা প্রত্যেকেই ইংরেজি বাক্যের আসল কাঠামোটা ঠিক বজায় রেখেছে। কাঠামোটা হল:

Chameli was in her room.
Chameli was in the garden.

এর সঙ্গে কেউ হয়তো বাড়তি খবর দিল: তখন বৃষ্টি হচ্ছিল কিংবা বাগানে আর কারা ছিল, ইত্যাদি। কিন্তু কাঠামোটা ঠিক রাখা চাই।

(এতদিনে তোমরা নিশ্চয় জেনে গেছ, প্রশ্ন করতে গেলে কাঠামো কী রকম হয় আর এমনি সাধারণ ভাবে কাঠামো কী রকম হয়।)

কিংবা ধরো তিন নম্বর প্রশ্নটা:



Was she having fun, too?

এর উত্তর খুব সংক্ষেপে দেওয়া যায়:

No, she was not.
Yes, she was.

আবার, রবির মতো খুলে বলা যায়:

No, as she did not like boys she could not have any fun with them.

অর্থাৎ

(1) Chameli did not like boys.

(2) She could not have any fun with them.

কিন্তু এ-দুটো বাক্য জুড়ে একটা করে দেওয়া যায়

Chameli did not like boys; so she could not have any fun with them.

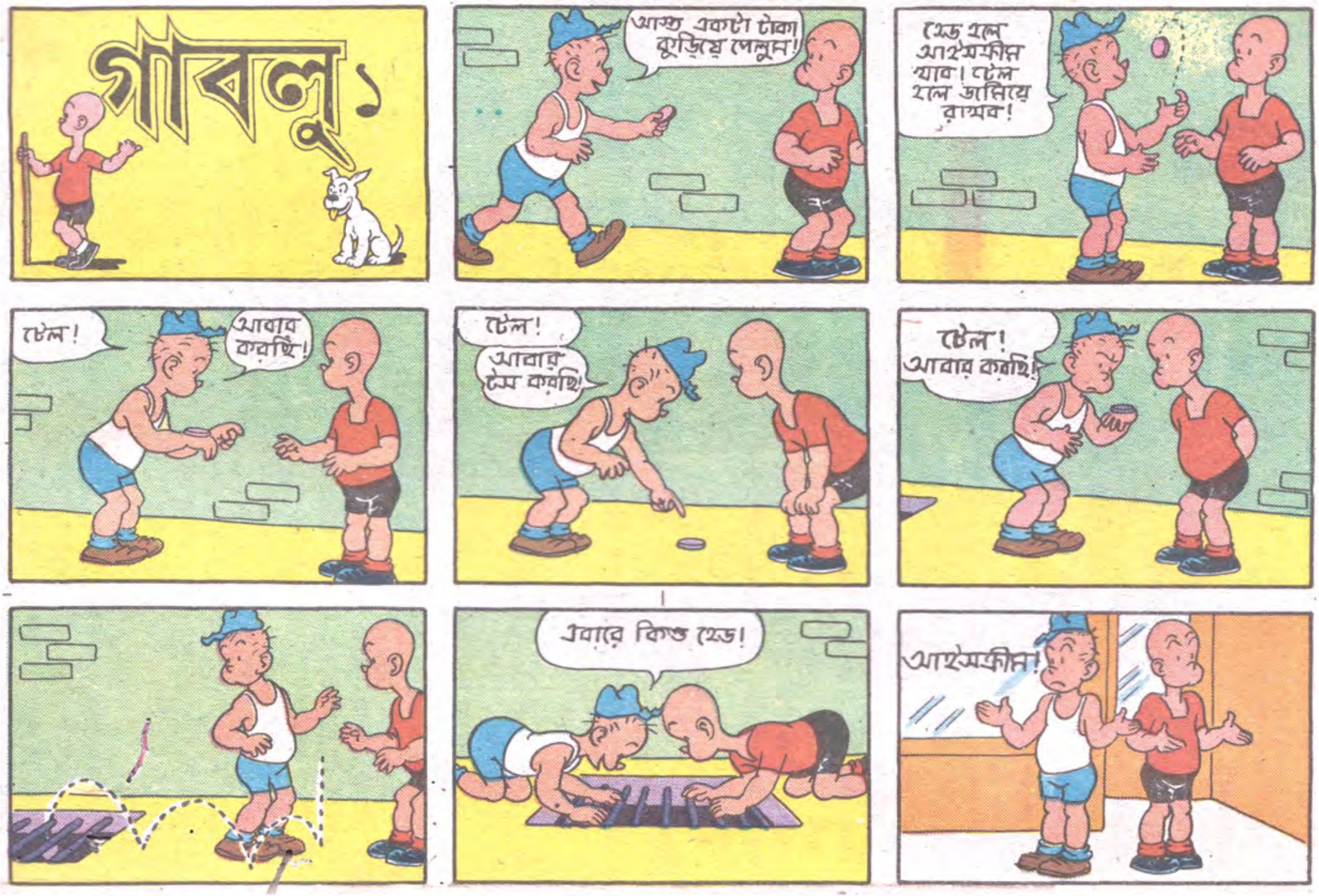
আবার, রবি যেমনভাবে জুড়েছে, তেমনিভাবে জোড়া যায়। অর্থাৎ রবি দুটো প্রশ্নের উত্তর একই বাক্যে দিয়েছে।

Q. 1. Was Chameli having fun too?

Q. 2. Why wasn't she having fun?

(Wasn't she = was she not)

এবারে যারা ভাল লিখেছে তাদের নাম: রবি রায় (কলকাতা), অদিতি মিত্র (দুর্গাপুর), মহুয়া ঘোষ (কলকাতা), আবীর অধিকারী (শ্রীরামপুর)।


গাবলু ১
আস্ত একটা টাকা কুড়িয়ে পেলুম!
হেড এলে আইসক্রীম খাব। টেল হলে জমিয়ে রাখব!
টেল!
আবার করছি!
টেল!
আবার টস করছি!
টেল! আবার করছি!
এবারে কিন্তু হেড!
আইসক্রীম!

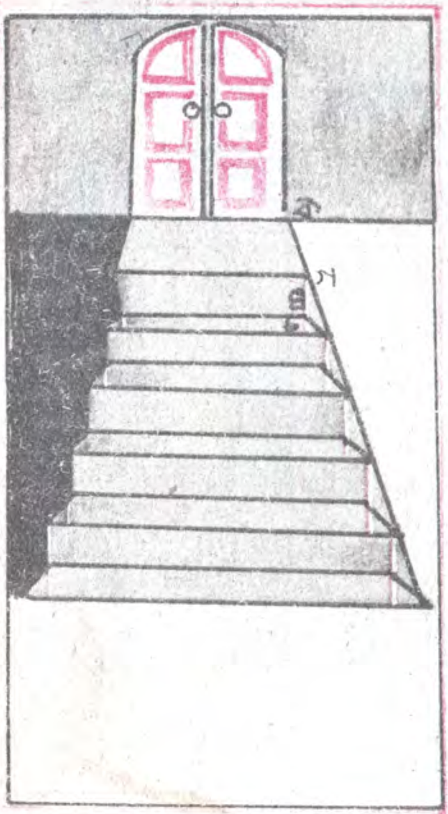

গাবলু ২
সমুদ্রতীর নোংরা করলে ৫০ টাকা জরিমানা!
চট্‌টট!
সমুদ্রতীর নোংরা করলে ৫০ টাকা জরিমানা!

সিঁড়ির ধাপ—আরও

রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

পর-পর কয়েক ভাগে তোমরা নিশ্চয়ই শিখেছ কেমন ভাবে সিঁড়ি ধাপে-ধাপে নীচে থেকে ওপরে উঠে যায় বা ওপর থেকে নীচে নেমে আসে।

এবার নমুনা লক্ষ করলেই বুঝতে অসুবিধে হবে না যে, কোন্ কোন রেখা চলে গিয়ে কেবল সিঁড়িই তোমার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। তোমাদের বোঝার সুবিধের জন্যে কেবল এক পাশের দাগই মুছে দেখালুম।



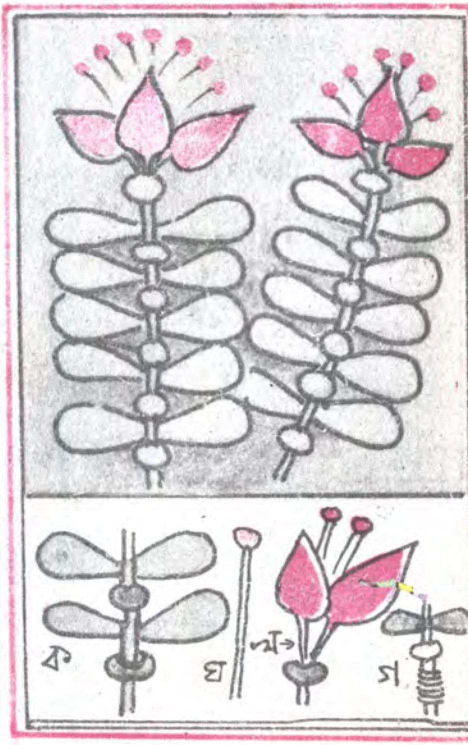
বাঁশের কাজ—আরও ফুল ২

কারিগর

গতবার এই কাজের জন্যে ফুলের কুঁড়ি আর পাতা তৈরি করে চেরা ডাঁটির মাঝে দিয়েছ। এবার জোড়া-পাতা ডাঁটির মাঝে দেওয়ার পর নীচের দিকে একটা পুঁতি এঁটে দাও। প্রত্যেকবার পাতা বসানোর পর পুঁতি এঁটে দিতে ভুলো না ('ক' ছবি)। সব শেষে যে পাতা দেবে তার নীচে আর পুঁতি না দিয়ে চেরা ডাঁটির মাঝে একটু আঠা দিয়ে পাতলা শক্ত সুতো বা তার দিয়ে শক্ত করে বেঁধে দাও ('গ' ছবি)।

এবার তৈরি ফুলগুলোকে ডাঁটির আগায় বাঁধবার আগে সরু ছোট পুঁতি বসানো কাঠিগুলো ('ঘ' ছবি) নিয়ে এক সঙ্গে সাজিয়ে বেঁধে ফুল আর পাতার কাজ শেষ করো। সব কাজ শেষ হলে এই ফুল পাতা সমেত ডাল নিয়ে মনের মতো করে ঘর সাজাও।

জেনে রাখো—বাঁশের পাতি আর ফুলের কুঁড়ি করার আগে অন্তত দিন দুই বাঁশের টুকরোকে জলে ভিজিয়ে নেবে। তাতে কাজের সুবিধে।





শীতে শুষ্ক ত্বক কোথা ? সে আজ হাসির কথা... পন্ডস্ কোল্ড ক্রীম মেখে

কনকনে শীত ত্বকের পক্ষে নিদারুণ, নিষ্ঠুর ! হাসলে আপনার চোখ আর হাঁ-মুখের পাশে যে রেখা পড়ে তা শীতে শুকিয়ে যায়। শীতের এই নির্দয় ব্যবহারে আপনার ত্বক ফেটে, শুকিয়ে, বলিরেখায় ভরে যায়। এ অবস্থায় কেবল আপনার ত্বকের আর্দ্রতার অভাব পুরণ করলেই যথেষ্ট নয়। এর জন্যে চাই আরো কিছু—যেমন, বাড়তি গুণের প্রাকৃতিক তেল, যা পণ্ডস্ কোল্ড ক্রীমে পাওয়া যায়।



মুখ, গলা, হাত, কনুই আর পা... যেখানেই শীতের জন্যে পণ্ডসের সুরক্ষার প্রয়োজন হবে, একটুখানি ক্রীম মেখে নেবেন। আপনার রূপ ফুটে উঠবে আপনার ত্বক হবে আপনার মতই নিশ্চিন্ত, প্রাণবন্ত !

এখন সুবিধেজনক টিউবেও পাওয়া যায়

শীতে পরিচর্যার বাড়তি পুষ্টিতে ভরপুর পণ্ডস্

লিন্টাস-PIL.CC.3-1810 BG